শওকত ওসমানের *জননী*-তে লোকসংস্কৃতির চালচিত্র

তাশরিক-ই-হাবিব*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের কথাশিল্পের পথিকৃৎদের মধ্যে শওকত ওসমানের `নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গল্প লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চা ক্রমশ সম্প্রসারিত হলেও পরিণত লেখক হিসেবে উপন্যাসেই তিনি একান্ত সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *জননী*-তে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের জমিদারি শাসনভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের মহেশডাঙা গ্রামের কৃষিজীবী প্রান্তিক লোকগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও বহমান সংস্কৃতির পরিচয় বিশ্বস্তরূপে উপস্থাপিত। মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামটিতে স্বল্পসংখ্যক সনাতন ধর্মাবলম্বী বাগদি ও তিওররাও বাস করে। গ্রামটির অধিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনের পরতে পরতে মিশে আছে বাঙালি লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপাদান। তাদের সংহতি ও মানবিক চেতনার উজ্জীবনের তাগিদে এ উপন্যাসে বাঙালি লোকসংস্কৃতির চালচিত্র অনবদ্যভাবে শিল্পরূপ পেয়েছে। এ নিবন্ধে সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পথিকৃৎদের মধ্যে শওকত ওসমানের (১৯১৮-১৯৯৭) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার ধারায় আন্তরিক প্রচেষ্টার স্বাক্ষর গদ্যশিল্পে বিচ্ছুরিত হলেও, কবিতা দিয়েই তাঁর লেখনীর সূত্রপাত। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, অনুবাদ, স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনী প্রভৃতি তাঁর সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন। বহুপ্রজ লেখক হিসেবে তিনি যে খ্যাতি ও স্বীকৃতি জীবদ্দশাতেই অর্জন করেছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। গল্প লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চা ক্রমশ সম্প্রসারিত হলেও পরিণত লেখক হিসেবে উপন্যাসেই তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সমকালীন কথাশিল্পী আবু রুশদ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা অমূলক ছিল না — 'কবিরূপে শওকত ওসমান প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন কি পারবেন না, কোনোটাই এখন ঠিক করে বলা যায় না। এদিক দিয়ে তাঁর সম্ভাবনা এখনো নিঃশেষিত হয় নাই। তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি আশা করবার মতো প্রতিশ্রুতিও তিনি এ পর্যন্ত দিতে পারেন নাই। তবে সৌভাগ্যের কথা এই, গদ্যলেখক হিসেবে শওকত ওসমান ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন। কথাশিল্পী রূপে তাঁর সম্ভাবনা প্রচুর।'[১] *বণী আদম* শওকত ওসমানের লেখা প্রথম উপন্যাস। এটি ১৯৪৬ সালে লেখা শুরু হলেও সম্পূর্ণ হয়নি। সেই অংশটুকুই ১৯৪৬ সালে *আজাদ* পত্রিকার ইদসংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এরপর লিখিত অংশের পাণ্ডুলিপি লেখকের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমি

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

থেকে পাণ্ডুলিপি পুনরুদ্ধার করা হয় এবং অসমাপ্ত উপন্যাসটি সমাপ্ত করে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসেবে ১৯৯০ সালের ইদসংখ্যা *বিচিত্রা*য় প্রকাশিত হয়।'[২] বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত নিরীক্ষায় সবচেয়ে উৎসাহী ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান। তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিক বাংলাদেশ ভূখণ্ডের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সংকটের ইতিহাসের স্মারক হয়ে আছে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলো রচিত হয়েছে ষাট এবং সত্তরের দশকে। সরাসরি বক্তব্য প্রকাশের জটিলতাহেতু তিনি আঙ্গিকে এনেছেন অভিনবত্ব। "স্বাধীনতা পূর্বকালে কলোনি-শোষণ ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ হিসেবে পুরাণাশ্রিত-ঐতিহ্য ও ইতিহাস-অবলম্বী রূপক ও প্রতীকী উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে। আধুনিক উপন্যাসের এ মননশীল প্রকরণকে তিনি সচেতনভাবেই অবলম্বন করেছেন[৩]। আপাতদৃষ্টিতে অতীতচারী হলেও তাঁর শিকড় প্রোথিত ছিল সমকাল তথা বর্তমানে। শওকত ওসমান তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনের তাগিদে মুসলমান ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। বর্তমানকে অতীতের দর্পণে অভিব্যঞ্জিত করতে গিয়ে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের আঙ্গিকের উপাদানগুলো পেল নতুনত্ব। মুসলমান ঐতিহ্যকে স্বকীয়রূপে সংযুক্তির পাশাপাশি উপন্যাসের আখ্যানবিন্যাস, ভাষা, দৃষ্টিকোণ, চরিত্রায়ণ, পরিচর্যারীতি আলাদা রূপ ধারণ করেছে। বাংলার গ্রামীণ জীবনবাস্তবতা, প্রান্তিক মানুষের নিত্যদিনের টানাপড়েন আর অভাব-অনটনের হাহাকার, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মান্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় জীবনবাদী অবস্থান তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয়। তাঁর কথাসাহিত্যে বারবার উঠে আসে "পল্লীজীবনের দুর্দশা ও পরিস্থিতির চাপে আত্মবিনাশের চিত্র, ... প্রতিবাদ বিদ্রোহের অসামান্য রূপ; ... সমাজের অজস্র অপরাধের শাণিত সমালোচনা। গোঁড়ামিকে আঘাত করেছেন তিনি বারবার; ধর্ম ব্যবসায়ী ও মুখোশধারীদের অভ্যন্তর উদ্‌ঘাটন করেছেন তিনি; পৌনঃপুনিকভাবে পরিহাস বিদ্রুপ ঝলক দিয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়"।[৪] তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো *বণী আদম*, *জননী* , *ক্রীতদাসের হাসি*, *চৌরসন্ধি*, *সমাগম*, *রাজা উপাখ্যান*, *জাহান্নম হইতে বিদায়*, *দুই সৈনিক*, *নেকড়ে অরণ্য*, *জলাংগী*, *রাজসাক্ষী*, *পতঙ্গ পিঞ্জর*, *আর্তনাদ*, *পিতৃপুরুষের পাপ* , *রাজপুরুষ* প্রভৃতি।

শওকত ওসমানের (১৯১৮-১৯৯৭) *জননী*[৫] উপন্যাসে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের জমিদারি শাসনভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের[৬] মহেশডাঙা গ্রামের কৃষিজীবী প্রান্তিক লোকগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও বহমান সংস্কৃতির পরিচয়[৭] মেলে। যদিও এ গ্রাম মুসলমান অধ্যুষিত, তবু স্বল্পসংখ্যক সনাতন ধর্মাবলম্বী বাগদি ও তিওররাও এখানকার বাসিন্দা। গ্রামটির অধিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনের পরতে পরতে মিশে আছে বাঙালি লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপাদান। মহেশডাঙার বাসিন্দাদের বিশিষ্ট পরিচয় তথা ওই সমাজের লোকজচেতনায় সন্নিহিত রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন, প্রাত্যহিক আচার-আচরণ, চালচলন, কথাবার্তা, অনুসৃত ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতি। শাস্ত্রীয় ধর্মের অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে বহুযুগ ধরে প্রচলিত ধর্মের লৌকিক

আবহকে মিলিয়ে নেয়ার প্রবণতাও তাদের আচরণে লক্ষণীয়। ফলে ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতিও যে আন্তরিকতার টান গ্রামবাসীর মধ্যে জেগে ওঠে, তা-ই তাদের মধ্যে বিস্তার ঘটায় উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক চেতনার। এ উপন্যাসে[৮] হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লোকসমাজের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি-আচার, বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধ শাস্ত্রীয় ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডিকে অতিক্রম করে যায়। প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজন, বিবিধ প্রতিকূলতা ও ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তা লোকসমাজের এরূপ আচরণের অন্তরালে সক্রিয়।[৯] নিজেদের অজান্তেই লোকসমাজভুক্ত মানুষেরা পরস্পরের প্রতি মমতা, দরদ ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যা যেকোনো জনগোষ্ঠীর সংহতি ও স্থায়িত্বকে টিকিয়ে রাখার মুখ্য অবলম্বন। ধর্মকে হাতিয়ার করে স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসারীদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পথে উস্কে দিয়ে ফায়দা হাসিল ক্ষমতালোভী হিন্দু জমিদার রোহিণী চৌধুরী ও তার প্রতিপক্ষ হাতেম মওলানার অনুসারীদের পক্ষে যে অসম্ভব, এর দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে রয়েছে। লোকমানুষের সংস্কৃতিতে বহমান অসাম্প্রদায়িক চেতনার অন্তর্নিহিত শক্তির এ বিশেষত্ব নির্ভর করে তাদের আন্তঃসম্পর্কের গভীরতার ওপর। এ উপন্যাসে মহেশডাঙা গ্রামের প্রান্তিক কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর চালচিত্র সাবলীলভাবে রূপায়িত হয়েছে। এতে কুশীলবদের অনুসৃত লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডার অনবদ্যভাবে উপস্থাপিত।[১০]

১. লোকবিশ্বাস

এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এসব লোকবিশ্বাস তাদের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। লোকসমাজে প্রচলিত এসব লোকবিশ্বাসে সন্নিহিত রয়েছে জাগতিক সংকট ও প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা এবং পারমার্থিক শুভবোধ। মুসলমান সমাজে প্রচলিত লোকবিশ্বাসগুলো মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণ ও রীতিনীতি, ইহলৌকিক সমৃদ্ধি ও পারলৌকিক কল্যাণ সম্পর্কিত —

ক. দরিয়াবিবি এক বদনা পানি আনিয়া দিল। ... এক কাজ করো না, ওজু করতে একটু ডান ধারে সরে যাও। কতগুলো ছাঁচি কদুর বীজ পুঁতেছিলুম, কড়ে আঙুলটাক গাছ বেরিয়েছে। পানি ত রোজ দিই। আজ একটু ওজুর পানি পড়ুক। আর হুজুরের কদম-ধোওয়া পানি। (শওকত, ২০০১ : ১৩৩)

খ. বৌমা ... দরিয়াবিবির জবাব সংক্ষিপ্ত : কী। তোমার কাপড়ের টানাটানি। দুটো কাপড় পেয়েছিলাম। ... আসেক্‌জান তারপর আঁচল-ঢাকা দুটো কাপড় বাহির করিয়া বলিল, দুটো কাপড় তুমিই পর। আমার যা আছে চলে যাবে। ... দরিয়াবিবির কণ্ঠস্বর চাঁচাছোলা : কোথা থেকে পেলে শুনি? ... ও পাড়ার ইজাদ চৌধুরীর মা ইন্তেকাল করেছিল, কাল মিশকীন খাওয়ালে আর কাপড় জাকাত দিলে। ... জাকাত! আমি নেব জাকাতের কাপড়? আমার স্বামী বেঁচে নেই? ছেলে নেই? মুখে তোমার আটকালো না? (শওকত, ২০০১ : ১৫৭)

গ. আসেক্‌জান প্রায়ই গাঁ হইতে ... দাওয়াৎ পায়। ধনীদের বাড়িতে চর্ব-চোষ্যের বহু আয়োজন হয়। আসেক্‌জান শুধু নিজের উদরপূর্তি করিয়া আসে না। অনেক সময় নানা খাবার সঙ্গে আনে। অন্ধকার ঘরে তার অংশ ভোগ করে আমজাদ অথবা নঈমা। দরিয়াবিবির চোখে কয়েকবার ধরা পড়িয়াছে তারা। আসেক্‌জানও তার জন্য তিরস্কার ভোগ করে। ... পরলোকগত ব্যক্তির চল্লিশার খাবার সঙ্গে করিয়া আনিতে আসেক্‌জানের কোন দ্বিধা নাই। দরিয়াবিবি ছেলেদের অমঙ্গল চারিদিকে যেন দেখিতে পায়। (শওকত, ২০০১ : ১৬৬)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'অজু' বা শরীর ধোয়া পানির 'পবিত্রতা'গুণ বা অলৌকিক শক্তি সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে দরিয়াবিবির সংলাপে। তার মতে, যেহেতু আজহার পরহেজগার ব্যক্তি, তাই তার অজুর পানি পেলে চারাগাছটি সতেজ ও সবলভাবে বেড়ে উঠবে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয়, দরিয়াবিবি আসেক্‌জানের দান হিসেবে গৃহীত জাকাতের শাড়ি গ্রহণে অসম্মত। ইসলাম ধর্মে অর্থসম্পন্ন, ব্যক্তির পক্ষে দরিদ্র, অসহায়, নিরন্ন মানুষের জন্য দান-খয়রাতের বিধান প্রচলিত। তবে এ অনুশাসনের সঙ্গে কালপরিক্রমায় যুক্ত হয়েছে বাঙালি লোকবিশ্বাস। তাই দরিয়া বিবি নিজের সংসারের অনটন সত্ত্বেও ইজাদ চৌদুরীর মায়ের মৃত্যু উপলক্ষে বিতরণ করা শাড়ি গ্রহণে অসম্মত। তার ধারণা, এর ফলে সংসারে কোনো বিপদ ঘটতে পারে। বিশেষত, স্বামী-সন্তানদের নিয়ে কায়ক্লেশে দিনযাপনের আশঙ্কাবশত সে আসেক্‌জানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বলাবাহুল্য, এর অন্তরালে যুক্তি-বুদ্ধির কোনো ভূমিকা নেই। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আর্থিক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদের ধর্মীয় আচরণের অংশ হিসেবে পরিবারের মৃত সদস্যদের পারলৌকিক মঙ্গলের অভীপ্সায় গরিব, অনাথ ব্যক্তিদের একবেলা ভালো খাবার খাওয়ানোর রীতি বা চল্লিশার উল্লেখ লক্ষণীয়। আসেকজান সুযোগ পেলেই এতে অংশ নেয়। তবে দরিয়াবিবি কোনোমতেই চায় না, তার ছেলেমেয়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে গরিব-দুঃখীকে বিতরণ করা খাবার খাক। আকস্মিক কোনো বিপদের আশঙ্কাবশতই সে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে।

২. লোকসংস্কার

লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সংস্কারের সম্প্রসারণ কালের প্রবাহে লোকসংস্কারে পরিণত হয়। ব্যক্তি যেসব লোকবিশ্বাসে একান্তভাবে শ্রদ্ধাশীল, তার অন্তর্গত অনেকগুলোই সমষ্টিমানুষের হিত-কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনে বিভিন্ন আচার, রীতি-নীতি সহযোগে নতুন রূপ লাভ করে লোকসংস্কারের মাধ্যমে। পেশা, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ভেদে লোকসংস্কারের রূপ বহুলাংশেই পৃথক হলেও কখনো কখনো একই লোকসংস্কার প্রায় অভিন্ন চেহারায় পৃথক লোকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। এ উপন্যাসেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এরূপ লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। বহুযুগ ধরে প্রচলিত

এসব সংস্কার লোকমানসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সাংসারিক গণ্ডিতে নিত্যদিনের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের তাগিদে, পারস্পরিক মঙ্গল কামনায়, সর্বোপরি তাদের গোষ্ঠীগত ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার প্রয়োজনে।

২.১ পানি পড়া, তাবিজ সংক্রান্ত

ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি, রক্ষণশীল ভাবনা গ্রামীণ লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিশ্বাস-সংস্কার ও ধ্যানধারণার মাধ্যমে শিকড় গেড়ে বসে। এক্ষেত্রে ধর্মকে ভিত্তি করে লোকসমাজে আধিপত্য বিস্তারে পীর-ফকির, দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। অলৌকিক শক্তি ও ধর্মীয় পরিচয়ের সুবাদে তাদের প্রতি লোকসমাজের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর সক্রিয় থাকে। প্রাত্যহিক জীবনে নানা সমস্যার সুরাহার প্রয়োজনে অশিক্ষিত লোকমানুষ তাদের শরণাপন্ন হয়। লোকসমাজে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতা কাহিনি-কিংবদন্তি-গুজবের মাধ্যমে পল্লবিত হয়। সে কারণেই নির্দিষ্ট সম্মানীর বিনিময়ে ঝাড়ফুঁক, পানিপড়া, তাবিজ বিতরণ ও অন্যান্য উপায়ে সমস্যার সমাধানের জন্য লোকমানুষেরা তাদের দ্বারস্থ হয়। মৃত পীরের কবরকে ভিত্তি করে দরগা গড়ে তোলা, সেখানে আগরবাতি জ্বালানো ও পীরের উদ্দেশ্যে মানত করা প্রভৃতি ধর্মীয় সংস্কার বহুকাল ধরে বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত। কখনো কখনো তা প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও লৌকিকতার আবহে লোকসমাজে এসব সংস্কারের প্রচলন এর গ্রহণযোগ্যতারই ইঙ্গিতবহ।

ক. আমু, বাছুর খুঁজতে তুমি কতদূর গিয়েছিলে? ... মাঠের দিকে গিয়ে কত ডাকলুম। কবরস্থানের কাছে ... তুই গিয়েছিলি পুরানো কবরস্থানের দিকে? ... শহীদি কবর-গাহের নাম পুরাতন কবরস্থান। হাল-আমলের অন্য গোরস্থান আছে। ... বারবার মানা করব, আমার কথা ত শুনবি নে। ... আমার ভয় লাগেনি ত, মা। ... নেই লাগুক। দাঁড়া, একটু বড়পীরের পানি-পড়া আনি। দরিয়াবিবি একটি বোতল ও মাটির পেয়ালা সঙ্গে আনল। ... আজহার খাঁ তীরবেগে ছুটিয়া আসিল তাহাদের নিকট। ... এসব কী! পানি-পড়া খাওয়াচ্ছ? ওহাবীর ঘরে এসব বেদাৎ। লোকে কী বলবে? ... এসব নিয়ে কেন গোলমাল বাধাও? ছেলেদের রোগ-দেড়ী আছে। আমি খাচ্ছি নাকি? ... দরিয়াবিবির হাতের কামাই নাই। পেয়ালার পানিতে এতক্ষণ আমজাদের কণ্ঠ ভিজিয়া গেল। (শওকত, ২০০১ : ১৩১)

খ. ব্যাপারটা আজহারের কানে গেলে সে একদিন আমজাদকে মখতবের মৌলবী সাহেবের কাছে লইয়া গেল। তিনি ফুঁক দিয়া দিলেন। সঙ্গে এক গ্লাস পানি-পড়া। গোটা একটা টাকা বাহির হইয়া গেল দুই ফুঁকের ঠেলায়। (শওকত, ২০০১ : ২৬২)

গ. সাকেরের মা সংসারের কথা জুড়িল। ... ছেলেমানুষ বৌটা তেমনি হয়েছে। ভয়েই মরে। চাষবাস করে খেতে বল, নিজের মানুষকে হাত কর। তা না। খালি দিনরাত ছেলের জন্য কান্না। কাঁচা বয়েস। ছেলে হওয়ার সময় কি পার হয়ে গেছে, বাবা? ..হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মত আজহার জবাব দিল, না, আমাদের হাসুবৌর আর কত বা বয়েস। কুড়ি পেরোয় নি। ... এখনই ছেলের জন্য হাঁপাহাঁপি। দোয়া তাবিজ আমি কি কম করতে বাকী রেখেছি! তবে মাস দুই হলো নিস্তার। (শওকত, ২০০১ : ১৭৩-১৭৪)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সন্তানের অমঙ্গলজনিত উৎকণ্ঠায় শঙ্কিত দরিয়াবিবি পীরের পানিপড়ার প্রতি আগ্রহী। আমজাদ বাছুর খুঁজতে কবরস্থানে গেছে, একথা শুনে দরিয়াবিবি ভীত হয়। কোনো রোগব্যাধি বা অশুভ শক্তির নজর থেকে ছেলেকে রক্ষার জন্য আজহারের নিষেধ সত্ত্বেও সে আমজাদকে পীরের পড়া পানি পান করায়। প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী, এরূপ আচরণ 'বেদাৎ' বা নিষিদ্ধ হলেও এ ব্যাপারে সে কোনো ঝুঁকি নিতে নারাজ। লোকসমাজে যুক্তি-বুদ্ধি ও ধর্মীয় অনুশাসন যে মানবিক মূল্যবোধের চেয়ে অধিক সক্রিয়, এটি তারই দৃষ্টান্ত। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বালক আমজাদের মনোলোকে দাদী আসেক্‌জানকে ঘিরে গড়ে ওঠা ভীতিবোধ কাটাতে তার বাবা-মার মক্তবের মৌলবির পানি পড়া পান করানোর তাগিদ লক্ষণীয়। স্কুলে ভূত সম্পর্কিত কাহিনি তার মনে যে ভীতিবোধ জাগিয়ে তোলে, তা সম্প্রসারিত হয় আসেকজানের মৃত্যুর ঘটনায়। সে-কারণেই নগদ এক টাকার বিনিময়ে মৌলবির দোয়া পড়ে দুবার ফুঁ দেয়া পানি পান করিয়ে আজহার-দরিয়াবিবি দম্পতি স্বস্তি পায়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লোকসমাজে পীরের দোয়া ও তাবিজের প্রতি ভক্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে। সন্তান গর্ভে ধারণের তাগিদে নারীরা পীরের দ্বারস্থ হয় তাবিজ, পানিপড়া বা ঝাড়ফুঁকের জন্য। এ উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয়, হাসুবৌর শাশুড়ি নাতির মুখ দেখতে উদগ্রীব। কারণ, তার লাঠিয়াল ছেলে সাকের সংসারের প্রতি উদাসীন। তার মার ধারণা, হাসু ছেলের জন্ম দিলে তবেই সাকের সংসারের প্রতি মনোযোগী হবে। সেকারণেই সে হাসুর গর্ভধারণের জন্য পীরের দোয়া-তাবিজ সংগ্রহ করে।

২.২ মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ

প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে লোকসমাজের অন্তর্গত সমষ্টিমানুষের ভালো-মন্দ, উন্নতি-অবনতি, কল্যাণ-অকল্যাণ জড়িত। আবার, পরিস্থিতিসাপেক্ষে যে ঘটনা একজনের পক্ষে হিতকর অন্য কারো ক্ষেত্রে তা ঠিক এর বিপরীত প্রতিপন্ন হতে পারে। লোকসমাজে গতানুগতিক ধারণায় আস্থা পোষণ ও অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মানসিকতা গুরুত্ব পায়। তাছাড়া আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ প্রায়ই থাকে না। তাই পারিপার্শ্বিক জগৎ-জীবন-প্রকৃতি সংক্রান্ত নানা ঘটনার যথাযথ কার্য-কারণ অনুধাবন করা তাদের পক্ষে কঠিন। এক্ষেত্রে তারা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত নানা সংস্কার ও মূল্যবোধের আলোকে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

ক. দরিয়াবিবি এক বদ্‌না পানি লইয়া বৃদ্ধার শনের মত শাদা চুলের উপর ঢালিতে লাগিল। ... আসেকজানের শরীর ভারমুক্ত হইতেছে। আহ্ শব্দে তার আনন্দ ধরা পড়ে। নারিকেল তেল আনিল দরিয়াবিবি। চুলের গুছির ভেতর বেশ চুকচুকে করিয়া দিতে লাগিল। ... খালা, দশ ঝঞ্ঝাটে শরীরটা জ্বলে গেল। মেজাজ ঠিক থাকে? কখন যে কাকে কি বলি–হদিস থাকে না। ... মা, জানটা আসান হলো। আল্লার দোয়া লাগুক তোমার শরীরে। (শওকত, ২০০১ : ১৬৭)

খ. আমজাদের ছোট বেলায় একবার খুব ম্যালেরিয়া হয়। জীবনের কোন আশা ছিল না। শৈরমী প্রতিদিন তাকে দেখিতে আসিত। একদিন সে কয়েকটি বাতাসা আনিয়া দরিয়াবিবির হাতে দিয়াছিল। ... কী হবে শরীদি? ... খোকাকে খাইয়ে দাও একটা। ... কিসের বাতাসা? ... শৈরমী মিথ্যা কথা বলে নাই। গ্রামের বারোয়ারীতলায় শিবালয়ে সে হরির লুট দিয়া আসিয়াছে আমজাদের নামে। তারই বাতাসা। ধর্মে বাধেই ত। দরিয়াবিবির মনেও খটকা লাগিয়াছিল। মরণাপন্ন পুত্রের শিয়রে দরিয়াবিবি কারো প্রাণে আঘাত দিতে রাজি ছিল না। যদি বাছার গায়ে 'বদদোয়া' লাগে। শৈরমীর সম্মুখেই সে আমজাদকে বাতাসা খাইতে দিয়াছিল। আল্লা কি মানুষের মন দেখেন না, যিনি সব দেখেন? অখ্যাত পল্লীর জননী হৃদয়েও সেদিন এই প্রশ্নই বারবার জাগিয়াছিল। (শওকত, ২০০১ : ২৩২)

গ. জলিল শেখ পাটের ব্যাপারী। নৌকা আছে তিন চারখানা। বেশ অবস্থাপন্ন ঘর। সেখানকার আয়োজন কল্পনাই করা চলে। ... কাপড় দু'টি দরিয়াবিবি আধ-অন্ধকারে বারবার তুলনা করিয়া বলিল, এই লাল সরু পাড়টা নিলাম, খালা। ... বেশ, বেশ! আমার কি আর এসব মানায়, মা! শাদা কাফন পরে কবরে যেতে পারলেই ভাল। ... বাজে কথা কেন, মুখে, খালা? এই সকালে আর কোন কথা মুখে আসে না বুঝি। (শওকত, ২০০১ : ১৬৭)

ঘ. কাজের চাপে ক'দিন আমিরন চাচী এই বাড়ি আসিতে পারে নাই। ... একদিন আসিয়া জেরা শুরু করিল, বুবু, তুমি নাকি ছেলেদের বড় মারধোর কর? ... পোড়াজানে যদি মারধর করি, কী অন্যায়টা করি? এগুলো মরলে আমার হাঁড় জুড়োয়। ... আমিরন চাচী বাধা দিল, ছি ছি বুবু, এমন অপয়া কথা মুখে আনে! আমার একটা। সেও কম জ্বালায় না। ... একটা আর দুটো। এরা জ্বালাতেই আসে। একজন ত মুখই আর দেখায় না। তার জন্য জ্বলছি। আর সঙ্গে যে ক'টা আছে, তারাও কম জ্বালাচ্ছে না। আল্লা এগুলো তুলে নিতে পারে না? (শওকত, ২০০১ : ২৯৯)

ঙ. দরিয়াবিবি মরহুম শ্বশুরের অজ্ঞতার উপর হাজার লানত বর্ষণ করিয়াছিল। তিনি জীবিত অবস্থায় এই বণ্টন-ব্যবস্থা করিয়া গেলে পথের ভিখারিণী হইত না সে। (শওকত, ২০০১ : ১৬৪)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে দরিয়াবিবির ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তার মঙ্গল কামনায় আসেক্জানের স্রষ্টার নেকনজর প্রার্থনা করা নিছক ব্যক্তিগত আচরণ নয়। লোকসমাজে এরূপ সংস্কার বহুকাল ধরে প্রচলিত। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে শৈরমীর আচরণে প্রকাশিত হয়েছে নারীর লোকসংস্কারের প্রতি অনুরাগের দৃষ্টান্ত। গ্রামসম্পর্কে পরিচিত অথচ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শৈরমী দরিয়াবিবিকে 'ভাবী' সম্বোধন করে। শুধু তাই নয়, সাংসারিক প্রয়োজনে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক প্রয়োজনের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে হাসি-ঠাট্টা ও আলাপের মাধ্যমে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। তাই শৈরমী বিড়ম্বিত জীবনের আক্ষেপ ও বেদনা অকপটে দরিয়াবিবিকে জানায়। সে দরিয়াবিবির অসুস্থ ছেলে আমজাদের সুস্থতা কামনায় গ্রামের বারোয়ারী মন্দিরের শিবালয়ে তার নামে হরির লুট দেয়. পূজার উপচার বাতাসা এনে খেতে দেয়। ধর্মীয় দূরত্বের চেয়ে হার্দ্যিক আন্তরিকতার আবেদন যে

লোকসমাজে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে, এ দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আসেক্জান ও দরিয়াবিবির পারস্পরিক সংলাপে লোকসমাজে মৃত্যুর অনুষঙ্গবাহী 'সাদা থান' প্রতীকার্থে গৃহীত। সাদা রং একদিকে যেমন শুভ্রতা-নিষ্কলুষতার প্রতীক, অন্যদিকে তা রঙহীনতা বা মৃত্যুর প্রতীকও বটে। আসেক্জানের সংলাপে উচ্চারিত সাদা থানের প্রসঙ্গ দরিয়াবিবিকে অমঙ্গলজনিত শঙ্কায় সন্ত্রস্ত করে তোলে। কেননা, বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু লোকসমাজে মৃতের সৎকারের জন্য সাদা থানের ব্যবহার প্রচলিত। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আমিরন চাচীর সঙ্গে আলাপে সাংসারিক যন্ত্রণায় জর্জরিত দরিয়াবিবির সন্তানদের প্রতি অসহিষ্ণুতার প্রকাশ লক্ষণীয়। অভাবের কশাঘাত, স্বামী আজহারের খামখেয়ালিপনা, ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা মেটানোর অসামর্থ্য প্রভৃতি তার অন্তর্লোকে যে বিক্ষোভ জাগায়, এরই পরিণতিতে সে তাদের মৃত্যু কামনা করে। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে করতে বিপর্যস্ত দরিয়াবিবি নিজের ভেতর পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে প্রকাশের জন্যই হঠাৎ খামখেয়ালের বশে এ অমঙ্গলসূচক কথা উচ্চারণ করে, যা শুনে আমিরন চাচী তাকে শান্ত করতে চায়। 'ঙ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে শ্বশুরের অদূরদর্শিতায় বিক্ষুব্ধ দরিয়াবিবির মনস্তাপ প্রকাশিত হয়েছে অভিশাপরূপে। কেননা, বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পিতার জীবদ্দশায় সন্তানের মৃত্যু হলে তার বিবাহিত স্ত্রী ও সন্তানেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সে-কারণেই মোনাদিরের স্বার্থান্বেষী চাচারা তার ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেয়নি। দরিয়াবিবি তার মৃত শ্বশুর জবেদ হোসেনের হঠকারিতায় ক্ষিপ্ত হয়। কেননা তার স্বামী বেঁচে থাকতে উক্ত সম্পত্তি ভাগাভাগি হলে দরিয়াবিবিকে সাংসারিক অনটনের পীড়নে প্রতিনিয়ত ভুগতে হত না।

২.৩ জ্বিন-ভূত, অশরীরী

গ্রামীণ লোকসমাজে বহুযুগ ধরে জিন, ভূত-প্রেত, অশরীরী সংক্রান্ত বিভিন্ন লোকসংস্কার প্রচলিত। বিজ্ঞানচেতনাহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকমানসে উদ্ভব ঘটলেও আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত এসবের টিকে থাকার ব্যাপারে ধর্মীয় শাস্ত্রের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। প্রকৃতির নানা অমীমাংসিত রহস্য, মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, মৃত্যু সম্পর্কিত ভীতিবোধ ও পরলোকে অনিশ্চিত পরিণতি সম্পর্কে উৎকণ্ঠা, এ পৃথিবীতে প্রিয়জনদের নিয়ে চিরকাল সুখেশান্তিতে বসবাসের আকুতি প্রভৃতি মিলেমিশে লোকসমাজে বিচিত্র সব কাহিনি, কিংবদন্তি ও আখ্যানের জন্ম দিয়েছে। নানা ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, অনুশাসনের সমন্বয়ে এ ধরনের সংস্কারের প্রচলন কালেকালে লোকসমাজে ঘটেছে। এসবের বিস্তার লোকসমাজে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়ে চলে। মহেশডাঙার বাসিন্দাদের চেতনালোকে এসব বিশ্বাস সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

ক. আজহার খাঁ লাঙল কোণে দাঁড় করাইয়া ফিরিতেছে। তাহার মনে হইল কে যেন দহলিজের কোণ হইতে পূর্বদিকে চলিয়া গেল একদম দাওয়ার কোণে। ... কে গো! ... কোন জবাব আসে না, ছায়া-মূর্তি অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ... কে গো! ... আমজাদ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিল, ভয় পায় সে। জ্বীন আসিয়াছে দহলিজে! মার কাছে

জ্বীনের গল্প শুনিয়াছে সে। দহ্লিজে কোরান শরীফ আছে একখানি। রাত্রে তাহারা নাকি কোরান মজীদ পড়িতে আসে। (শওকত, ২০০১ : ১৫৩)

খ. টাঁটি খুলিয়া দরিয়াবিবি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। না, কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। মনে একটু খটকা লাগিল। আনমনা দরিয়াবিবি আবার চুলাশালে ফিরিয়া আসিল। ... এইবার চোখকে অবিশ্বাসের কিছু নাই। সেই ছায়া তেমনই অবিকল টাঁটির উপর। কিন্তু অগ্রসর হওয়ামাত্র মিলাইয়া গেল। ... ভয়ানক ধাঁধায় পড়িয়াছিল দরিয়াবিবি। জীন-ভূতের ব্যাপার নয় ত। একটু ভীত হইল আজহার-পত্নী। (শওকত, ২০০১ : ২১৬)

গ. শাশুড়ী এই নির্বোধ রুগ্ন বধূটিকে চোখে চোখে রাখিতে চায়। জ্বীন-ভূতের পাল্লায় সর্বনাশ হইতে চলিয়াছে তার। সংসারে বংশধর না আসিলে পুত্র আর ঘরমুখো হইবে না। (শওকত, ২০০১ : ২৪২)

ঘ. আমজাদ কিন্তু ভয়ে একা একা ঘুমাইতে পারিল না কয়েকদিন। মোনাদির নাই কাছে। নিজের ছোট কুঠরীতে শুইতে তার বড় ভয় লাগে। ... স্কুলে পণ্ডিতের মুখে আমজাদ ভূতের কাহিনী শুনিয়াছিল। মন হইতে তা সহজে মুছিয়া যায় না।... মাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, মরে গেলে ভূত হয় মানুষ? ... যারা খারাপ লোক, তারা ভূত হয়। ... আসেক্ দাদি কি হোয়েছে? ... দরিয়াবিবি ঈষৎ বিচলিত হয় মনে মনে। ... আমার ভয় করে। দাদি রাত্রে পাশে ঘুমায়। ... আমজাদ তবু রাত্রে দরিয়াবিবির কোল ঘেঁষিয়া ঘুমাইত। বাহিরে কাঁঠাল গাছের বনে বনে দম্কা বাতাস লাগিলে সে মাকে জড়াইয়া ধরিত। গোরস্থান হইতে আসেক্জান দাদি লাঠি হাতে কারো চল্লিশা খাইতে যাইতেছে। (শওকত, ২০০১ : ২৬১-২৬২)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে রাতের অন্ধকারে দহলিজের কাছে আসতেই একটি ছায়ার অস্তিত্ব টের পেয়ে আজহারের অবচেতনলোকে ভীতিবোধ জাগ্রত হয়। ব্যাপারটি পাশে উপস্থিত আমজাদকেও আচ্ছন্ন করে। মায়ের কাছে শোনা জিন-সংক্রান্ত গল্প এভাবেই তার ভাবনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে জিন সম্পর্কে দরিয়াবিবির মনোলোকে পুঞ্জীভূত ভীতিবোধের প্রকাশ ঘটে, যখন সে অঘ্রাণের এক ভোরে চারপাশের নিস্তব্ধ প্রকৃতিলোকে আকস্মিকভাবে তার প্রথম পক্ষের ছেলে কিশোর মোনাদিরের সাক্ষাৎ পায়। মোনাদির অভিমানবশত চাচাদের বাড়ি ছেড়ে চলে এলেও মায়ের কাছে আসতে সে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কেননা, তার বাবা মৃত। সৎবাবা আজহারের বাড়িতে এর আগে সে আসেনি। তাই রান্নাঘরের পাশের বেড়ার ওপর তার ছায়া দেখে দরিয়াবিবির মধ্যে জ্বিনসংক্রান্ত ভীতিবোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সাকেরের মায়ের অবচেতনলোকে জিনসংক্রান্ত ভাবনার প্রকাশ ঘটে পুত্রবধূ হাসুর সন্তানহীনতায়। তার মধ্যে এরূপ বিশ্বাস ক্রমশ সুদৃঢ় হয় যে, জিনের নজর পড়ায় হাসু দিন দিন রুগ্ন হয়ে চলেছে। তাই সে গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারছে না। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বালক মনস্তত্ত্বে জিন-ভূত বিষয়ক লোকসংস্কার কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে, সেই দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত। স্কুলে পণ্ডিতের মুখে ভূত-সম্পর্কিত কাহিনি তার মনে যে ভীতিবোধের উদ্রেক করেছিল, তা নতুনভাবে পল্লবিত হয় দাদী আসেক্জানের মৃত্যুর

ঘটনায়। আমজাদ তার সঙ্গে রাতে ঘুমাতে অভ্যস্ত ছিল। সে ভয় পায় একারণে যে, দাদী হয়ত তার পাশেই শুয়ে আছে। কখনো বা রাতের অন্ধকারে কাঁঠালবনে দমকা বাতাসের কাঁপন তার মনোলোকে এ ভাবনা জাগিয়ে তুলত যে, আসেকজান লাঠি হাতে নিয়ে কারো চল্লিশা খেতে যাচ্ছে।

২.৪ দিব্যি দেয়া, শপথ করা, সত্য বলে প্রতিজ্ঞা করা

নিজের বক্তব্যকে জোরালোভাবে উপস্থাপনের জন্য অথবা বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে স্রষ্টা বা ধর্মীয় গ্রন্থ বা বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কিরা কাটা, দিব্যি দেয়া, শপথ করা প্রভৃতি বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত সংস্কার। আবার কখনো কখনো কোনো ব্যাপারে কাউকে দিয়ে জোরপূর্বক শপথ বা দিব্যি করিয়ে নেয়া হয় এ ভাবনা থেকে যে, শপথকারী যদি তার শপথ পূর্ণ না করে অথবা ভঙ্গ করে, তবে তার বিশেষ ক্ষতি বা অমঙ্গল হবে।

ক. দরিয়াবিবি একটি পান শৈরমীর হাতে দিয়া বলিল, দিদি, আঁচলের আড়ালে নিয়ে যাও। কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন বলো না, আমাদের ঘড়াটা। দিব্যি রইল, দিদি। ... শৈরমী উঠিয়া পড়িল। আবার বৃষ্টি শুরু হইয়াছে। দরিয়াবিবি তখনও ঘড়াটা নাড়াচাড়া করে। কত অনিচ্ছার প্রতিরোধ মনে, তবু ধীরে ধীরে পিতলের সামগ্রী শৈরমীর হস্তে তুলিয়া দিতে হইল। ... কাউকে বল না কিন্তু, দিদি। আমার মাথার দিব্যি। (শওকত, ২০০১ : ১৮৯)

খ. আচ্ছা ভাবী, আমার মাথার কিরে–দাদার কোন খবর পাওনি? তবে চুপচাপ বসে আছো? ... আর খবরের কোনো দরকার নেই। (শওকত, ২০০১ : ১৯৯)

গ. কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে বৌ আমজাদের হাত ধরিয়া বলিল, চাচা, আমার দোয়া লিখে দিয়েছো? ... দিয়েছি, হাসু চাচী। ... সত্য? কিরা দিচ্ছি আমার গা ছুঁয়ে বল। ... আমজাদ হাসুবৌর কাঁধ ছুঁইয়া বলিল, দিয়েছি, দিয়েছি, দিয়েছি, তিন সত্যি। (শওকত, ২০০১ : ২৯৬)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে দরিয়াবিবি শৈরমীকে দিব্যি করায় পিতলের ঘড়াটি অধর সাতের মায়ের নিকট বন্ধক দিয়ে পাঁচ টাকা এনে দেয়ার ঘটনাটি কারো কাছে প্রকাশ না করতে। কেননা, এ ঘটনাটি জানাজানি হলে মহেশডাঙায় খাঁ পরিবারের বংশমর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। শৈরমীকে আপন ভেবে বিশ্বাস করায় দরিয়াবিবি তার সাহায্য গ্রহণের পাশাপাশি এ ঘটনাটি নিজেদের মধ্যে গোপন রাখতে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে শৈরমী দরিয়াবিবির কাছে আজহারের প্রসঙ্গে জানতে যে মরিয়া, তার প্রকাশ ঘটে কিরা কাটার ঘটনায়। এর প্রত্যুত্তরে স্বামীর উদাসীনতা ও খামখেয়ালীপনা সম্পর্কে অতিষ্ঠ দরিয়াবিবির অসহিষ্ণুতা তার সংলাপে স্পষ্ট। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত হয় মোনাদিরকে সম্বোধন করে লিখিত চিঠিতে হাসুবৌর তার প্রতি ভালোবাসার আকুতি। অনাথ বালকটির প্রতি হাসুবৌ আগ্রহী। তাই সে দোয়া প্রার্থনা করে আমজাদকে দিয়ে চিঠি লেখায়। অন্যদিকে আমজাদ যেহেতু চিঠি লিখতে সমর্থ, তাই

সে চিঠিতে হাসুবৌর দোয়াও লিখে পাঠায় মোনাদিরের প্রতি এবং তিন সত্যি দিব্যি উচ্চারণের মাধ্যমে হাসুবৌর সমীহ ও বিশ্বাস অর্জন করে।

২.৫ অসুস্থতার প্রতিকারার্থে মানত করা, হরির লুট দেয়া

লোকসমাজে অসুস্থতার প্রতিকারার্থে পীর-দরবেশ ও মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করা, হরিলুটের বন্দোবস্ত করার রীতি বহুদিন ধরে প্রচলিত। আরোগ্য কামনায় অসুস্থ ব্যক্তির নিকটজনের এ ধরনের আচরণের পেছনে যুক্তি-বুদ্ধি কার্যকর না হলেও লোকসংস্কার সক্রিয়। পীর-দরবেশ ও দেবতার অলৌকিক শক্তিতে আস্থা স্থাপনের মাধ্যমে করুণা লাভ এ ধরনের লোকসংস্কার মেনে চলার উদ্দেশ্য।

> পথে একা-একা চলা আমজাদের সাহসে কুলায় না। পীরের মাজার রহিয়াছে বকুলতলায়। গাঁয়ের লোকেরা প্রতি জুম্মার রাত্রে মানৎ শোধ করিয়া যায়। আজদাহা সাপের পিঠে আরোহণ করিয়া দরবেশ সাহেব গভীর রাত্রে গ্রাম-ভ্রমণে বাহির হন। বড় মেহেরবান পরলোকগত এই দরবেশ, শাহ্ কেরমান খোরাসানী। সকলের দুঃখের পশরা তিনি একাকী বহিয়া বেড়ান। সামান্য অসুখে-বিসুখে পীরের মাজার একমাত্র আশ্রয়। ... কুড়িহাত বেড় মোটা বকুলের ... গুঁড়ির উপরে মোটা দু'টি ডাল। তার মাঝখানে একটি বিরাট গহ্বর। আজদাহা সাপ এইখানে বাস করে। মাঝে মাঝে দিনে বাহির হয়। কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। ... কিংবদন্তির অন্ত নাই। কত কাহিনী না দরিয়াবিবির কাছে আমজাদ শুনিয়াছে। গা ছমছম করে তার। ... জাগ্রত দরবেশ। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই মানত করে এই মাজারে। (শওকত, ২০০১ : ১৫২)

এ উদ্ধৃতিতে বকুলতলার পীরের মাজারে শুক্রবার রাতে গ্রামবাসীর মানত করার রীতি প্রচলিত। তাদের ধারণা, তিনি গ্রামবাসীর দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারে সমর্থ। তার উদ্দেশ্যে মানত করা হলে মনোভিলাষ বাস্তবায়িত হবে, এরূপ লোকসংস্কার মহেশডাঙার মুসলমান কৃষকসমাজে সক্রিয়। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও সমধর্মী আচরণ লোকমানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বহুযুগ ধরে প্রচলিত সংস্কারগুলোকে প্রাত্যহিক জীবনে কোনো না কোনোভাবে মেনে চলতে।

২.৬ নারী সংক্রান্ত

পুরুষতান্ত্রিক লোকসমাজে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান বহুকাল ধরেই গৃহ ও সংসারের গণ্ডিতে আবদ্ধ। সামাজিক উৎপাদন প্রণালি ও সাংসারিক ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য সেখানে পুরুষকে ঘরের বাইরে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। এর বিপরীতে নারীকে পরিবারের তত্ত্বাবধান, সন্তানের জন্মদান ও লালনপালন, রান্না এবং অন্যান্য গৃহস্থকর্ম সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হয়। এ উপন্যাসের নারীরাও অনুরূপ সামাজিক অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত দরিয়াবিবি পুরাতন একটি ঘড়া কারো কাছে ঋণের জন্য বন্ধক দিতে শৈরমীর সাহায্য চায়। তবে এ ঘটনা কেউ যেন জানতে না পারে, সেজন্য সে

শৈরমীকে অনুনয় করে। কেননা, খাঁ বাড়ির মর্যাদা যে সময়ের প্রবাহে ধূলিসাৎ হতে চলেছে, দরিয়াবিবি তা গ্রামবাসীকে জানাতে অসম্মত। যতদিন সে এ সংসারে আছে, ততদিন শত কষ্ট মেনেও তা চালিয়ে যেতে মরীয়া। কিন্তু বাঙালি লোকসমাজে এরূপ সংস্কার প্রচলিত যে, গৃহস্থ সামগ্রী ঘরের বাইরে গেলে অর্থাৎ অন্যের হাতে পড়লে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। যেহেতু আজহারের বাউণ্ডুলেপনা ও খামখেয়ালের কারণে দরিয়াবিবিকে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাই শৈরমীর সংলাপে ভবিষ্যতে আজহারের অমঙ্গলজনক পরিণতির ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে।

২.৭ অন্যান্য

ক. আর সে ফিরে আসবে! কোথা গেল, অতটুকু কচি ছেলে। ... আমি গণৎকারের কাছে শুনিয়ে আসব। কোন দিকে গেছে, কবে ফিরে আসবে ঠিক বলে দেবে, সেবার আমার বোনের দেবর এমনি–। (শওকত, ২০০১ : ২৭৭)

খ. অত ঘন জঙ্গলে আর যেয়ো না। বড় বড় সাপ আছে। ... কি সাপ আছে, মা? আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল। ... খুব বিষ সাপের, জাতসাপ আছে। ... মোনাদির হাসিয়া উঠিল– হ্যাঁ, সাপ আছে না হাতি। কই, আমরা একটা সাপের লেজও দেখিনি। ... আমজাদ হাসিতে যোগ দিল। –মা, বড়ভাই সাপের লেজ দেখেনি। সাপ কাটলে লেজ খসে যায়। না, মা? (শওকত, ২০০১ : ২২৫-২২৬)

গ. রহিম খাঁয়ের বাবাকে কে না জানত? সুদখোর। সুদের পয়সায় জমিদার–। ... চন্দ্র কোটাল বাধা দিয়াছিল এই সময়: তোমরা জান না, গরুর গায়ে ঘা হলে ন'টা সুদখোরের নাম লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিতে হয়। পোকা পড়ে যায়। (শওকত, ২০০১ : ১৪৯)

ঘ. শাশুড়ি হাসুবৌকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ... ওই যে অভাগীর বেটি, দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে কি আর আল্লা দেবে। সাকের না হলে আমাদের এত জ্বালাবে কেন? ... হাসুবৌ কোনো জবাব দিল না। ক্লান্ত দুই চোখ মাটির সমতলে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। ... খামাখা রাগ করো কেন, চাচি। এমন কচি বয়স, ছেলেমানুষ। পোয়াতিকে এমন ফজিয়ৎ করলে রোগে পড়বে যে। (শওকত, ২০০১ : ২০৩)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে অদৃষ্টের ওপর লোকমানুষের ভক্তির প্রকাশ লক্ষণীয়। যা অজ্ঞাত, রহস্যময়, অজানা অথচ নিজের জীবনঘনিষ্ঠ, তার স্বরূপ জানতে অসীম কৌতূহল লোকসমাজে বরাবর পরিলক্ষিত হয়। তাই গণৎকারকে দিয়ে হাতের রেখা পরীক্ষার মাধ্যমে অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত। দরিয়াবিবির কাছে ফিরে আসার একপর্যায়ে সৎপিতা আজহারের দ্বারা প্রহৃত হয়ে অভিমানবশত মোনাদির গোপনে অন্যত্র চলে যায়। ছেলের হদিশ পেতে দরিয়াবিবি প্রতিবেশী আমিরন চাচীর সাহায্য নেয়। তারই পরামর্শে গণৎকারের কাছে ছেলের সন্ধান লাভের উদ্যোগ দরিয়াবিবির সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও সন্তানের জন্য ব্যাকুল মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা এ ঘটনায় পরিস্ফুট। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সাপ সম্পর্কে লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘন জঙ্গলে বসবাসকারী

বিষাক্ত জাতসাপের লেজ রয়েছে এবং কাউকে কামড়ালে সেই সাপের লেজ খসে পড়ে, এরূপ সংস্কার লোকসমাজে প্রচলিত। বালক আমজাদ এ প্রসঙ্গে অবহিত হলেও তার সৎ বড়ভাই মোনাদির এ বিষয়টিকে হেসেই উড়িয়ে দেয়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সুদখোর ব্যক্তির প্রতি লোকসমাজের ঘৃণ্য মনোভঙ্গি প্রকাশিত। যেহেতু গ্রামবাসী আর্থিক সংকটে বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তার নিকট থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিতে বাধ্য থাকে তাই তার এরূপ নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় গরুর অসুস্থতার প্রতিকারের জন্য তার নাম ব্যবহারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সুদখোর সম্পর্কে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। একারণেই ব্যক্তিমানসে এরূপ লোকবিশ্বাসের প্রচলন ঘটে। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সন্তান জন্মদানে অসমর্থ তরুণী হাসুবৌর প্রতি তার শাশুড়ি সাকেরের মায়ের ভৎর্সনা প্রকাশিত হয়েছে। এরই সূত্র ধরে দরিয়াবিবি তাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে জানায়, অসুস্থ গর্ভধারিণীকে গালিগালাজ করলে রোগে ভুগে বরং তার অমঙ্গল হবে।

৩. লোকাচার

লোকসমাজে পরস্পরের সঙ্গে নিত্যদিনের ওঠা-বসা, চাল-চলন, কথাবার্তা, আলাপ ও কুশল বিনিময় প্রভৃতির সূত্রে নানা লোকাচারের সাক্ষাৎ মেলে। অশিক্ষিত লোকগোষ্ঠীর মধ্যেও সাংসারিক প্রয়োজনে, ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে লোকাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। নবজাতকের জন্ম সংক্রান্ত, বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত, আতিথেয়তা, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে লোকসমাজে মান্য নানা লোকাচারের দৃষ্টান্ত রয়েছে এ উপন্যাসে। পারস্পরিক সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচার ও সম্পর্কের প্রগাঢ়তা এসব লোকাচারের মাধ্যমে লোকসমাজের সংহতি ও ঐক্য ধরে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। লোকসমাজে গোষ্ঠী, বৃত্তি, পেশা ও ধর্মীয় পরিচয়সূত্রে বিভিন্ন লোকাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। এসব লোকাচার কখনো কখনো ধর্মীয় রীতিনীতির অংশ, যার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জাগতিক কল্যাণ ও পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন; পাশাপাশি পারলৌকিক উন্নতি সাধন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব লোকাচার গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্তঃক্রিয়ার অংশ। প্রাত্যহিক জীবনধারনের নানা কাজে একের ওপর অন্যের নির্ভরশীলতা, বিপদে-আপদে এগিয়ে আসার মানসিকতা, সাধ্য অনুযায়ী পরস্পরকে সাহায্য করার অন্তর্তাগিদ লোকাচারের অংশ হয়েও নিছক এ গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পারস্পরিক আলাপচারিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গোষ্ঠীগত বা ধর্মীয় পরিচয়ের সীমানা পেরিয়ে লোকসমাজে সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। এ উপন্যাসে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত লোকাচারের চেয়ে লোকমানুষের যাপিত জীবনে একের প্রতি অন্যের বন্ধুত্বময় আচরণে এর পরিচয় অনুপুঙ্খভাবে পাওয়া যায়। যেমন — আজহারের খালা বৃদ্ধা আসেক্‌জান নিজের ভরণপোষণের জন্য মহেশডাঙার অর্থসঙ্গতিপন্ন পরিবারের দান-খয়রাত, জাকাত, মিসকিন খাওয়ানো প্রভৃতির ওপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল। অথচ জাকাত হিসেবে ইদে

বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে শাড়ি পেলে সে দরিয়াবিবিকে তা নির্দ্বিধায় দিতে চায়। শুধু তাই নয়, দাওয়াত হিসেবে প্রাপ্ত খাবারের উদ্বৃত্ত অংশটুকু সে আমজাদ ও নঈমার জন্য আনে। কখনো বা বাড়িতে চাল না থাকলে সে কারো কাছ থেকে আনা চালে দরিয়াবিবির সংসারের অন্নাভাব সামলাতে চায়। নিছক আত্মীয়তার খাতিরে নয়, বরং ভালোবাসা, মমতার প্রগাঢ় বন্ধনে আবদ্ধ বলেই তাদের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা লক্ষণীয়। তেমনিভাবে দরিয়াবিবি যখন প্রতিবেশী সাকেরের মায়ের কাছে পুত্রবধূ সন্তানের জননী হওয়ার আনন্দে দাওয়াত খাওয়ার বায়না করে, সে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। শুধু দরিয়াবিবি, তার স্বামী আজহার ও তাদের ছেলেমেয়েই নয়, আসেক্‌জানকেও দাওয়াত দেয়া হয়। সাকেরের স্ত্রী হাসু যে কোনো প্রয়োজনে দরিয়াবিবির পরামর্শ নেয়। শাশুড়ির দ্বারা কখনো কখনো তিরস্কৃত হবার বেদনা, এমনকি মাতৃত্বজনিত অপূর্ণতার কষ্ট তার কাছে জানিয়ে মনের গ্লানি দূর করে। দরিয়াবিবিও চন্দ্র কোটালের খাতিরযত্নে বরাবর সচেষ্ট। যেহেতু চন্দ্র কোটাল পান খেতে ও ধূমপান করতে পছন্দ করে, তাই সে বাড়িতে এলেই দরিয়াবিবি আমজাদকে দিয়ে সেসব পাঠিয়ে তাকে আপ্যায়নে সচেষ্ট থাকে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে দরিয়াবিবির সামাজিক সম্পর্ক লোকাচারের গণ্ডিকে ছাপিয়ে আত্মীয়সুলভ ঘনিষ্ঠতায় উন্নীত হয়।

> আমিরন চাচীর সংসার ছোট। কিন্তু দরিয়াবিবির সংসারের এতগুলি পেট চালানো সহজ নয়। প্রথম দিকে সহানুভূতি কারো কম ছিল না। কিন্তু তারও সীমা আছে। বেচারা চন্দ্র নিজেই অস্থির। সে চাষ করে, মাছ ধরে, গান করে। কিন্তু সব সময় রোজগার হয় না। তবু তার আন্তরিকতা অকৃত্রিম। নিজে না আসিলেও বোনকে পাঠাইয়া খোঁজ-খবর লয়। এলোকেশী খালি হাতে আসে না। কোন দিন মাছ, মাঠের ফসল, অন্ততঃ একখানি কুমড়া হাতে সে লৌকিকতা রক্ষা করে। (শওকত, ২০০১ : ২৯২)

আসেক্‌জানের মৃত্যুর পর দরিয়াবিবি তার দাফন এবং মিসকিন খাওয়ানোর মতো ধর্মীয় লোকাচার সুষ্ঠুভাবে পালন করে। তেমনিভাবে গার্হস্থ্যবিষয়ক লোকাচারেও সে মনোযোগী।

> তখনও সন্ধ্যা দেওয়া হয় নাই, দরিয়াবিবির খেয়াল ছিল না। তাই আবার বলিল, আমি ডিপে জ্বেলে দিচ্ছি, একটু সবুর কর বাবা।
> নাচ-দুয়ারে প্রদীপ দেখাইতে আসিয়া দরিয়াবিবি গরুগুলির চেহারাও একবার দেখিয়া লইল। ... নিমগাছের নিচে গোয়াল-খড়ের গাদাটি বড় অদ্ভুত ঠেকিল আজ দরিয়াবিবির। নিঃসঙ্গ মনে হয় ভিটের আশ-পাশ। প্রদীপ দেখাইয়া তাই তাড়াতাড়ি সে পুত্র-কন্যার নিকট ফিরিয়া আসিল। (শওকত, ২০০১ : ১৮১)

ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নিচুবর্ণের বাগদি নারী শৈরমীকে গ্রামের ব্রাহ্মণরা হরহামেশা তিরস্কার করলেও দরিয়াবিবি তার প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক। এমনকি সে তাকে 'সখী' বিবেচনায়ও দ্বিধাহীন। আর্থিক অনটনকালে কখনো বা তার কাছ থেকে শাক সংগ্রহ করা, কখনো বা পিতলের ঘটি বন্ধক দিয়ে কারো কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য সে

শৈরমীর ওপর নির্ভরশীল। তার অসুস্থ যুবক পুত্র গণেশের মৃত্যুতে দরিয়াবিবি শোকার্ত।

৪. লোকসাহিত্য

এ উপন্যাসে মহেশডাঙার লোকসমাজে প্রচলিত লোকসাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান লক্ষণীয়। এসব উপাদান গ্রামবাসীর নিত্যদিনের আচরণ, অভ্যাস, বিশ্বাস ও মানসিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কোনো লোকগোষ্ঠীর সৃষ্টিশীলতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। আর, বিভিন্ন লোকসমাজের স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনেও সেই লোকগোষ্ঠীভুক্ত শিল্পীদের সৃষ্টিসমূহ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। লোকসাহিত্য বংশপরম্পরায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়। আমজাদ আসেক্‌জান ও তার মায়ের কাছে জিনের, স্কুলের পণ্ডিতের কাছে ভূতের কাহিনি শোনে। গ্রামবাসীর মধ্যে দরবেশ সম্পর্কিত নানা কিংবদন্তি প্রচলিত। চন্দ্র কোটাল মুখেমুখে নানা ছড়া ও লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে; সে ভাড়-নাচের দলপতি। লোকসমাজে প্রচলিত প্রবাদ, বাগধারা ও রূপকথার অনুষঙ্গও গ্রামবাসীর মনস্তত্ত্বে প্রভাব বিস্তার করে।

৪.১ লোকসঙ্গীত

এ উপন্যাসে মোট সাতটি লোকসঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে দুটি পূর্ণরূপে, অন্যগুলো কয়েক চরণের আংশিক রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। এসব গানের গীতিকার ও গায়ক চন্দ্র কোটাল, যার ভাড়নাচের দল রয়েছে এবং বিভিন্ন উৎসবে-আয়োজনে গ্রামে সে এর আসর বসায়। উপন্যাসের '২' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, বালক আমজাদের সঙ্গে পরিহাসের সুযোগ হিসেবে সে 'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত গানটি গায়। '৭' পরিচ্ছেদে পিতার প্রতি অভিমানী আমজাদকে খুশি করতে সে 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত গানটি শোনায়। 'গ' ও 'ঘ' উদ্ধৃতিভুক্ত গান দুটি রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কেন্দ্রিক, যা চন্দ্রকোটাল পরিবেশন করেছিল আজহারের সঙ্গে আলাপকালে। আজহার ধর্মপরায়ণ হলেও ভাঁড়দলের নাচের আসরের প্রতি আগ্রহী। ফলে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনির অভিনয় ও এ বিষয়ক গান তাকেও আকৃষ্ট করে। 'ঙ' সংখ্যক গানটি ব্যঙ্গাত্মক হলেও তা শুনে শ্রোতা হিসেবে আমজাদ ও মোনাদির খুশি হয়। সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতা গ্রামের মানুষের মাঝে বিভাজন সৃষ্টির অন্যতম উপায়। তাই স্রষ্টার দোহাই দিয়ে ক্ষমতালোভী গোষ্ঠী সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে বলে এর বিরুদ্ধে চন্দ্রকোটালের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে 'চ' সংখ্যক গানে। 'ছ' কবিগানের প্রতিনিধি হিসেবে 'ছ' সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত গানে হাস্য-পরিহাসেরই প্রাধান্য, যা শ্রোতাদের মনোযোগ ও আগ্রহকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ।

ক. সর্ষে ক্ষেতের আড়াল হল চাঁদ,
চোখে তার মানুষ-ধরা ফাঁদ
ও উদাসিনী লো (শওকত, ২০০১ : ১৪১)

খ. কথা কয় না

আমার ময়না,
হায়, হায় রে ... (শওকত, ২০০১ : ১৮৪)

গ. মথুরায় ফিরে এসে
ভুলে গেছ বৃন্দাবনের কথা।
আমি তোমায় চিনেছি শ্যাম,
খাইনি চোখের মাথা। (শওকত, ২০০১ : ২১১)

ঘ. মথুরা ছেড়ে কোটাল যমালয়ে চলে,
মাঠে মাঠে গোপিনীরা ভাসে চোখের জলে,
ও-ও-ও-ও–। (শওকত, ২০০১ : ২১৩)

ঙ. প্রাণ যদি দিলে তুমি
প্রাণ-চোর শেষে–
কোকিল কেন রেখে গেলে
এমন পোড়া দেশে। (শওকত, ২০০১ : ২২১)

চ. ভগবান, তোমার মাথায় ঝাঁটা,
ও তোমার মাথায় ঝাঁটা।
যে চেয়েছে তোমার দিকে
তারই চোখে লঙ্কা-বাটা।
ও ছড়িয়ে দিলে, ছড়িয়ে দিলে
মারলে তারে তিলে তিলে
ও আমার বৃথা ফসল কাটা
ও তোমার মাথায় ঝাঁটা। (শওকত, ২০০১ : ২৬৭)

ছ. চাচা এল অবেলায়।
এখন কোথায় কি পাই?
খেতে দেওয়া দায়।
হাঁস রয়েছে পুকুর পাড়ে
মুরগি আর ডিম না পাড়ে
ঝোপে-ঝাড়ে বন-বাদাড়ে
শেয়ালছানাও নাই॥ ...
ভাইপো তুমি কর না ভাবনা
আমি ওসব কিছুই খাব না।
ঘরে আছে মুট্‌কী চাচী
তারে কর না জবাই॥
আহা চাচা, আক্কেল বটে
বলিহারি, বলিহারি যাই।। (শওকত, ২০০১ : ২৮৯)

৪.২ কিংবদন্তি

ক. ভিটা সংলগ্ন একটি বড় পুষ্করিণী ছিল। বর্তমানে মজা পুকুর মাত্র। পাড়ে কাঁটাবন দুর্ভেদ্য। কয়েক বছর আগেও পদ্মপাতায় পুকুরের সামান্য পানিও দেখা যাইত না।

... খাঁর পুকুরে পীরের কুমির ছিল। সেই প্রবাদ এখনও মুখে মুখে ফেরে। (শওকত, ২০০১ : ১২২)

খ. পথে একা-একা চলা আমজাদের সাহসে কুলায় না। পীরের মাজার রহিয়াছে বকুলতলায়। গাঁয়ের লোকেরা প্রতি জুম্মার রাত্রে মানৎ শোধ করিয়া যায়। আজদাহা সাপের পিঠে আরোহণ করিয়া দরবেশ সাহেব গভীর রাত্রে গ্রাম-ভ্রমণে বাহির হন। বড় মেহেরবান পরলোকগত এই দরবেশ, শাহ্ কেরমান খোরাসানী। সকলের দুঃখের পশরা তিনি একাকী বহিয়া বেড়ান। সামান্য অসুখে-বিসুখে পীরের মাজার একমাত্র আশ্রয়। ... কুড়িহাত বেড় মোটা বকুলের ... গুঁড়ির উপরে মোটা দু'টি ডাল। তার মাঝখানে একটি বিরাট গহ্বর। আজদাহা সাপ এইখানে বাস করে। মাঝে মাঝে দিনে বাহির হয়। কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। ... কিংবদন্তির অন্ত নাই। কত কাহিনী না দরিয়াবিবির কাছে আমজাদ শুনিয়াছে। গা ছমছম করে তার। ... জাগ্রত দরবেশ। (শওকত, ২০০১ : ১৫২)

৪.৩ রূপকথার অনুষঙ্গ

দারিদ্র্যের উলঙ্গ রূপ দরিয়াবিবির চোখে যেন এই প্রথম ধরা দিল। সে কেন এখানে আসিয়াছে স্বর্ণপুরী হইতে নির্বাপিত রাজকন্যার মত? (শওকত, ২০০১ : ১৫৭)

কেমন বর্বর মনে হয় চন্দ্র কোটালকে খলিলের নিকট। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সুগোল, গুম্ফবিশিষ্ট কোন দৈত্য নয়, হঠাৎ শাহানপুরে আসিয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া গেল। (শওকত, ২০০১ : ২১৩)

হাসুবৌ শাশুড়ীকে দজ্জাল আখ্যা মনে মনেই দিতে থাকে। কাঠ-কুড়োনী বুড়ি বলিলে তবে আমজাদের গায়ের রাগ যায়। (শওকত, ২০০১ : ২২৩)

আলীবাবা ও চল্লিশ দস্যুর কাহিনী পাঠ করিতেছিল মোনাদির। কাসেম রত্ন-গুহার মধ্যে আবদ্ধ। বাহিরে আসিবার মন্ত্র সে ভুলিয়া গেছে। 'সিসেম খোল' এইটুকু শব্দ মোনাদিরের মুখে–আবার তাকে পাঠ থামাইতে হইল। (শওকত, ২০০১ : ২২৪)

আমার দরিয়াবুবু কেমন? তার ছেলে রাজপুত্তুরের মত দেখতে হবে না? (শওকত, ২০০১ : ২৩০)

পাঁচটি টাকা সাত রাজার ধন নয়। তবু সে কথাই আগে ভাবিতে হয়। (শওকত, ২০০১ : ২৯৩)

৫. লোকখাদ্য

এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্রসামগ্রীর উল্লেখ রয়েছে। আর্থিক দৈন্য ও টানাপড়েনে ভুক্তভোগী স্বল্পআয়ের মানুষের পক্ষে সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী অধিক অর্থব্যয়ে খাওয়া অসম্ভব। তাই কোনোমতে পেটের ক্ষুধা মেটাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী তাদের খাদ্যতালিকাভুক্ত। বাঙালি মুসলমান কৃষক পরিবারের খাদ্যতালিকা লক্ষ্য করতে হলে আজহার-দরিয়াবিবি দম্পতির প্রাত্যহিক আহারের দিকে লক্ষ করা জরুরি। দরিয়াবিবি ছেলেকে প্রায়ই গরম ভাত খেতে দিতে পারে না। আমজাদ পান্তা ভাত খেতে চায় না। আর্থিক সঙ্গতি থাকলে দরিয়াবিবি কখনো ডাল ও চুনা মাছের

ঝোল, কখনো আলুভাজি করে। মেহমান এলে ঘরে পালা মুরগির ডিম, কখনো বা মুরগি জবাই করে মাংস রান্না হয়। আমজাদ কখনো কখনো ভাতের পরিবর্তে চালভাজা খেয়ে রাত কাটায়। আজহার দিনের পর দিন বাড়িতে অনুপস্থিত থাকলে তখন শৈরমীর পুটুলি বেঁধে আনা মেটেশাক ও কলমীশাকই দরিয়াবিবির অবলম্বন। কখনো কখনো চন্দ্র কোটাল, হাসুবৌ ও আমিরন চাচী দরিয়াবিবিকে সাহায্য করে। কোনোমতে চেয়েচিন্তে ছোটখাটো কাজকারবারের মাধ্যমে তারা সাংসারিক ব্যয়ভার নির্বাহ করে। চন্দ্র কোটাল কখনো কখনো আমজাদকে দশ-বারোটি বড় আকৃতির চিংড়ি, কখনো বা আজহারের হাতে দুটি তপসে মাছ গুঁজে দেয়। তেমনিভাবে মোনাদির ও আমজাদ চন্দ্র কোটালের বাড়ি গেলে এলোকেশী তাদের কখনো মুড়ি, কখনো সেদ্ধ আলু দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করায়। হাসুবৌ মাতৃত্ববশত আমজাদ, মোনাদির ও আম্বিয়াকে সন্দেশ খেতে দেয়। সে একদিন দরিয়াবিবি ও তার ছেলেমেয়েদের দাওয়াত করে নতুন ছাচি লাউ দিয়ে ক্ষীর রান্না করে। কখনো বা দরিয়াবিবি নঈমাকে দেয়, ময়রার দোকান থেকে মিঠাই কিনে খেতে। আমিরন চাচীর ঘরে ছেলেমেয়েদের জন্য মোয়া, নাড়ু বরাবর মজুত থাকে। আজহার জীবিকা নির্বাহের তাগিদে রাজমিস্ত্রির কাজে ভিনগাঁয় গেলে কখনো কখনো রান্নাবান্নার ঝামেলা এড়াতে দু'পয়সার মুড়ি ও বাতাসায় রাতের ক্ষুধা মেটাতো। দরিয়াবিবির সাংসারিক অনটন সম্পর্কে অবহিত আমিরন চাচী কখনো কখনো তার প্রতি অভিমান করত, সে নিতান্ত প্রয়োজনেও চাচীকে আপন না ভাবায়। অথচ সাংসারিক প্রয়োজনে কারো সাহায্য গ্রহণ করতে দরিয়াবিবি বরাবর কুণ্ঠিত থাকত।

> উপবাস এই সংসারে দরিয়াবিবির জন্য অচেনা কিছু নয়। মাঝে মাঝে কোনদিন ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়েরা হাঁড়িতে ভাত থাকা পর্যন্ত আর ক্ষান্ত হয় না। দরিয়াবিবি তখন পরিবেশন করিয়াই খুশি। এই চালাকি মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। তখন আমজাদ লজ্জিত হয়। নঈমা, শরীফা কি-বা বোঝে। আমিরন চাচীর কাছে ধরা পড়িলে দরিয়াবিবি খুব বকুনি খায়। একদিন ত চাচী অভিমান করিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, আমরা ত আত্মীয়-স্বজন নই, আমাদের কাছে কেন কিছু বলবেন, বুবু। দুমুঠো চাল কি তরকারী আমজাদকে দিয়ে আনালে কি আমি অসুবিধায় পড়তাম? (শওকত, ২০০১ : ২৯৭)

খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে চুন দিয়ে পান খাওয়া ও হুকায় তামাক সেবন গ্রামীণ লোকসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত। চন্দ্র কোটাল আজহারের বাড়িতে গেলে আমজাদকে দিয়ে সে দরিয়াবিবির কাছে চুন সহযোগে পান ও তামাক খাওয়ার আর্জি জানায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মহেশডাঙার বাসিন্দারা পান খেতে অভ্যস্ত। নারকেলী হুকায় তামাকের ধূমপানের অভ্যাস মহেশডাঙার গৃহস্থদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মহেশডাঙার পুরুষেরা হুকায় ধূমপানে অভ্যস্ত। এটি নিছকই অভ্যাস নয়, বরং বাড়িতে অতিথি এলে আতিথেয়তার অংশও বটে। চন্দ্রকোটাল আজহারের সঙ্গে দেখা করতে এলে দরিয়াবিবি আমুকে দিয়ে হুকা, তামাক ও পান পাঠায়। নিছক অভ্যাস হিসেবেই নয়, ক্ষেতে ফসল তোলা বা ফসল বোনার কাজে

বিরতিকালে, এমনকি দুপুরে ও রাতে খাবারের পরও মহেশডাঙার গৃহস্থরা ধূমপানে মেতে ওঠে।

৬. লোকচিকিৎসা

মহেশডাঙার গ্রামীণ সমাজে লোকচিকিৎসা বলতে প্রচলিত রয়েছে কবিরাজি চিকিৎসা। দূরবর্তী শহরে গিয়ে বেশি টাকা খরচ করে নামকরা চিকিৎসক দেখানোর সামর্থ্য তাদের নেই বললেই চলে। যে কোনো রোগের প্রতিকারার্থে গ্রামবাসী দরবেশ ও পীরের পানিপড়া, তাবিজ, ও মৌলবির দোয়া-দরুদের ফুঁকের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে তারা পীর-দরবেশের দরগায়, দেবতার মন্দিরে মানত পূর্ণ করা, হরির লুট প্রভৃতির আয়োজন করে। এছাড়া বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে কারো বিপদ হলে টোটকা বা ঘরোয়া চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কেও তারা অবহিত। যেমন —

ক. বাতাসে দরিয়াবিবির চুল এলোমেলো, হঠাৎ এক মুঠো খড় হাতে সে ডাকে, আমু, এদিকে আয় ত বাবা, আমার চোখে কি পড়েছে দ্যাখ্। ... দরিয়াবিবি ততক্ষণ বসিয়া পড়িয়াছে। ... ভারী কর্‌কর্ করছে চোখটা। ... দরিয়াবিবি কাপড়ের খুঁটে মুখের ভাপ দিতে থাকে। ... আমজাদ ফালি লুঙি পরিয়াছিল। মা'র দেখাদেখি সে-ও লুঙির খোঁট মুখের ভিতর ঢুকায়। (শওকত, ২০০১ : ১২৮-১২৯)

খ. খলিলের ডান হাতের আঙুলের আগাগুলো ফোঁসকায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ... চটপট আলু বাটিতে বসিল আজহার। ... ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়া আলুর পুল্‌টিশ বাঁধিয়া দিল আজহার। হাতের যন্ত্রণা কমিয়া আসিতেছে ধীরে ধীরে। (শওকত, ২০০১ : ২১০)

গ. (আজহার) জেলা-জেলান্তর ঘোরার ফলে বাঁকুড়ার দুরন্ত ম্যালোরিয়া আগেই দেহে বাসা বাঁধিয়াছিল। ... রোগ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে এক মন্দিরের ঠাকুরের কাছ হইতে চন্দ্র গাছের শিকড় আনিয়া আজহারের হাতে বাঁধিয়া দিল। (শওকত, ২০০১ : ২৯০)

ঘ. সাকের ভাই কোথায়? ... এবার পায়ে চোট লেগেছে। চুন-হলুদ করে দিলাম কাল। আজ ভালো আছে। (শওকত, ২০০১ : ২৯৫)

৭. লোকপ্রযুক্তি

লোকসমাজে আধুনিক শিক্ষার অপ্রতুলতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ না পাওয়ার ব্যাপারটি বরাবর লক্ষণীয়। তবে তারাও প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডারকে নানা প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের সামর্থ্য রাখে। বংশপরম্পরায় অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং স্বভাবগত কৌতূহল তাদের মনোলোকেও নতুন কিছু আবিষ্কারের ব্যাপারে উৎসাহ যোগায়। এ উপন্যাসে তেমন দৃষ্টান্ত স্বল্প হলেও লক্ষণীয়। যেমন —

ক. চন্দ্র আবার উঠিয়া পড়িল। নদী-পথের দিকে তার মুখ। বাধা দিল আজহার। সে জিজ্ঞাসা করে, কি হলো চন্দর? ... সারাদিন রোদ পেয়েছে, তরমুজ খুব গরম। ছেলেটার খেয়ে আবার শরীর খারাপ করবে। ... আজহার ঈষৎ বিরক্ত হয়। ... এখন তবে কী করবে? ... নদীর হাঁটু-জলে বালির তলায় পাঁচ মিনিট রাখলেই, ব্যস। ... একদম বরফ। ব-র-ফ। (শওকত, ২০০১ : ১৪৪)

খ. দরিয়াবিবি মাটির ডিপা আর করঞ্জ তেল আনিল। কেরোসিন সব সময় কেনার পয়সা থাকে না। দরিয়াবিবি খুব ভোরে উঠিয়া করঞ্জ ফল কুড়াইয়া আনে। তাই কলুর ঘানি হইতে তেল হইয়া ফেরে। (শওকত, ২০০১ : ১৫৫)

৮. লোকক্রীড়া

এ উপন্যাসে যেসব লোকক্রীড়ার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো হলো লাঠিখেলা, লুকোচুরি ও মার্বেল খেলা। মোনাদির অন্য গ্রাম থেকে যখন মহেশডাঙায় ফিরে আসে, তখন আমজাদের জন্য লাটিম আনে। তারা আমিরন চাচীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মার্বেল খেলে। কারণ মার্বেল খেলার উপযোগী প্রশস্ত চত্বর তাদের বাড়িতে নেই। এছাড়া দুই ভাই কখনো কখনো মহেশডাঙার নির্জন অরণ্যে, তরুলতার জঙ্গলে, মূল ভিটার আশেপাশে লুকোচুরি খেলে। তাদের প্রতিবেশী সাকের লাঠিয়াল। মারমুখো ও দুরন্ত স্বভাবের সাকের ছোটবেলায় নিজের গরজে লাঠিখেলা শিখেছিল। সে জমিদারের হুকুমে বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করতে লাঠি চালায়। তাকে দেখে মোনাদির ও আমজাদের লাঠিখেলা শেখার শখ জাগে।

৯. বিনোদন

এ উপন্যাসে মহেশডাঙার বাসিন্দাদের চিত্তবিনোদনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ভাড়-নাচের উল্লেখ রয়েছে। লক্ষণীয়, গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান সমাজে নাচ-গান-বাজনাযোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন বা এতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবু লোকমানুষেরা সাংসারিক কর্মব্যস্ততা ও জীবিকা নির্বাহে পরিশ্রান্ত হলে ভাড়-নাচ দেখে পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে। প্রতিবেশী চন্দ্র কোটাল গান গাইলে আমজাদ তার প্রতি বিরক্ত হয়। কেননা, গান গাওয়া ইসলামী অনুশাসনে নিষিদ্ধ। তবে চন্দ্র কোটাল ধর্মীয় রীতিনীতি মান্য করার পরিবর্তে নিজের খেয়ালে চলতে আগ্রহী। জীবনসংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে সে ভাড়-নাচের দল গঠন করে অভিনয় চালাত রঙ্গমঞ্চে। শুধু নিজ গ্রাম থেকেই নয়, আশপাশের গ্রাম থেকেও পূজা-পার্বণে তার দলকে বায়না করা হত। গ্রামবাসী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভাড়-নাচ উপভোগ করলেও একপর্যায়ে এলোকেশীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠায় চন্দ্র কোটাল অবশেষে গার্হস্থ্য জীবনে স্থিত হয়ে কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় কৃষিকাজের স্বল্প আয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাওয়ায় এবং রাজেন্দ্রের মতো অর্থশালী যুবকের অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে সে পুনরায় ভাড়-নাচের দল চালায়। রাজেন্দ্র কৃষকের সন্তান হলেও অনেকদিন শহরে থেকে সেখানকার থিয়েটারে অভিনয় করে সুনাম কামিয়ে, ভাড়-নাচের ব্যাপারে খুঁটিনাটি পর্যন্ত জেনেবুঝেই চন্দ্র কোটালকে নিয়ে মহেশডাঙায় নিজেদের দল চালায়। যেমন অভিনয়ে, তেমনি গান গাইতে ও বেহালা বাজাতে সে পারদর্শী। অন্যদিকে চন্দ্র কোটালও যে কোনো পরিস্থিতিতে মুখে মুখে তৎক্ষণাৎ গান রচনা করতে পারদর্শী।

কোন পালার অভিনয় করতে হবে, কাকে কোন চরিত্রে মানাবে, তাদের সাজসজ্জা ও পোশাকাদি, সবকিছুর ব্যাপারেই রাজেন্দ্র সচেতন। আজহার চন্দ্র কোটালের সঙ্গে আলাপকালে লক্ষ করে—

> চন্দ্র কোটাল অলস নয়। রোজগারের পন্থা সে সহজে আবিষ্কার করে। আজহার অবাক হইয়া গেল। চন্দ্র কোটাল বাস্তর ঢিবির পাশেই আর এক চালাঘর তুলিয়াছে। তার ভিতর একটি ভাঙা হারমোনিয়াম, পুরাতন বেহালা, পরচুলা আর বাইজি সাজার পোশাক। (শওকত, ২০০১ : ২৩৭)

'বস্ত্রহরণ পালা'র আয়োজন করে অচিরেই চন্দ্র কোটালের ভাড়-নাচের দল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যে বছর কৃষকদের ক্ষেতের ফসল বেশি ফলে, সে বছর তারা ভাড়-নাচের প্রতিও উৎসাহী হয়ে ওঠে। দশ-বিশ মাইল দূরবর্তী গ্রাম-গঞ্জ থেকেও এ দলের জন্য বায়না আসায় চন্দ্র কোটালের দলের আর্থিক উন্নতিও দ্রুতই ঘটতে থাকে।

১০. লোকভাষা

এর অন্তর্গত হলো লোকসমাজে প্রচলিত লোকভাষায় আশ্রিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ ও পদসমূহ, বাগধারা প্রভৃতি। লক্ষণীয়, গ্রামীণ সমাজে ব্যবহৃত হলেও লোকভাষা স্বভাবে একান্তই অমার্জিত ও রুচিহীন নয়। গালিগালাজ ও প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দরাশি, ধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ, বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি লোকভাষায় লক্ষণীয়। এছাড়া আঞ্চলিকতার প্রভাবও এভাষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রাম, মফস্বল, শহর, নগর, বন্দর এমনকি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বা স্বল্পব্যবহৃত শব্দরাশিও লোকভাষার অন্তর্গত। তবে এ উপন্যাসে লেখক কুশীলবদের সংলাপ হিসেবে বেছে নিয়েছেন শিষ্টজনের উচ্চারিত প্রমিত বাংলা কথ্যরীতিকে, যা পাত্রপাত্রীর জীবনবাস্তবতা ও ভাষিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে তেমন মানানসই হয়নি। এর ফলে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ লোকসমাজের প্রাত্যহিক জীবনে আশ্রিত মুখের ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাঠক পায় না। অন্যদিকে, উপন্যাসের কোনো দৃশ্য বা পরিস্থিতির বিবৃতি, বর্ণনা এমনকি চরিত্রসমূহের অন্তর্ভাবনাকে ভাষ্যরূপ দিতে গিয়ে লেখক গ্রহণ করেছেন সংস্কৃতানুসারী গুরুগম্ভীর সাধু রীতিকে, যা বহুলাংশেই চরিত্রের মনোভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের যৌক্তিকতাকে ক্ষুণ্ন করে। তবে, মহেশডাঙার বাসিন্দাদের ভাষার আস্বাদনে কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি হয় চরিত্রসমূহের সংলাপে আশ্রিত বাগধারা, প্রবাদ, ছড়া, টিকা-টিপ্পনি ও রঙ্গ-ব্যঙ্গ, দেশজ কথ্য শব্দ ও পদসমূহের সমাহারে। বাঙালি মুসলমান কৃষক জীবনের ইতিবৃত্ত উপস্থাপনায় তিনি প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দরাশিও নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। এ উপন্যাসে লোকভাষার অন্তর্গত উপাদানসমূহের মধ্যে শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১০.১ শব্দভাণ্ডার

দেশজ শব্দরাশি : পাতাপুতি, ডোবা, বেউড়, চাতাল, উঠান, মজা, হলকা, আঁটি, মুঠি, কুঁচো, খড়কুটো, খামাখা, দমকা, ফুড়ুক, ঝিলিক, গুড়ুক, বাজখাঁই, দাউদাউ, ঝাঁকড়া, পিচুটি, উস্‌খুস্‌, ছাঁচি, কড়ে, খুঁতখুঁত, টিপ্‌পনী, চাড়, কোল, পাড়া, কোন্দল, মেলা, গুম, ঘাট, কোল, ঘুপটি, চাঁটি, ঝোপ, পিঠুলি, দমকা, হাঁপ, পশলা, আঁজলা, ঝামাল, ঢেলা, ভ্যাবাচ্যাকা, জাবর, টোকা, আল, এলোপাথাড়ি, প্যাঁচাল, সটান, হেঁয়ালি, ঝাঁকড়া, বিবাগী, হল্লা, খটকা, ধাড়ী, ন্যাওটা, হল্লা, লণ্ডভণ্ড, মশকরা, ভাঁটা, চোঁয়াড়ে, ডিংরে, বেয়াড়া, গুড়ুম, প্যানপ্যান, লুটেপুটে, ছিট, খটকা, ছ্যাচড়, মুনিশ, পুটুলি, উস্‌খুস্‌, ভ্যাপসা, খোয়ারি, কুটনি, ঘাবড়ে, হিমশিম, পোয়াতি, ঝুনঝাট প্রভৃতি।

ক্রিয়া : ঠেকে, সেঁকিতে, ঝাঁপাইয়া, ঢালিতে, ঝেটিয়ো, ছুঁতে, চাখিবার, নিভিয়া, চুকিয়া, খেটেপুটে, গুঁজিয়া, মুছাইয়া, ঢুলিতে, পুঁতেছিলুম, চুকিয়াছে, গুটাইতে, হেলানো, ঘামিয়া, কুঁচকাইতেছিল, বকাসনি, ঝেটোনো, ঝিমাইতেছিল, খেটেপুঁটে, ভাসিয়া, ঢুলিতেছিল, ভ্যাবাচ্ছে, চোঁয়াইতে, সোঁধায়, বাছিতে, বহিয়া, ঢলিয়া, হাঁকছিলে, গিলেছি, জুড়িয়া, কুটিতে, জিরোই, থমকিয়া, চটাইতে, চুকাইয়া, ঠেঙাইতে, সেঁধোবে, থমকিয়া, কুটিতে, মুষড়াইয়া প্রভৃতি।

বিশেষণ : চাড়, ফিকে, তোলপাড়, দমকা, কুঁচানো, খামাখা, ফালি, সিদরে, ঝাঁকড়া, উসখুস, ক্ষওয়া, খোঁটা, দুঁদে, গুঁতো, খেই, তেতে, ঝলসানো, কুচকুচে, ভ্যাবাচ্যাকা, এলোপাতাড়ি, প্যাঁচাল, পিটপাট, দুলকি, খটকা, ধাড়ী, চাঁচাছোলা, ফ্যাকাশে, ডরুক, উপচিয়া, ধান্দা, ডিংরে প্রভৃতি।

অনুকার অব্যয় : দুম্‌দুম্‌, চিড়বিড়, কর্‌কর্‌, ফুড়ুক-ফুড়ুক, ঝিরিঝিরি, খলখল, হুড়ুম-দুড়ুম, ঝম্‌ঝম্‌, হাউমাউ, ভক্‌ভক্‌, ঝনঝনা, হাঁপাহাঁপি, খনখনে, ঝমঝম, ঠক্‌ঠক্‌, হাঁকাহাঁকি, টসটস, প্যানপ্যান, গনগনে প্রভৃতি।

১০.২ বাগধারা

পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে বক্তার মনের ভাব শ্রোতার নিকট সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে বাগধারার ভূমিকা রয়েছে। লোকসমাজের ভাষিক ভুবনে বাগধারার ব্যবহার অনায়াসেই ঘটে থাকে। কথোপকথনের বিষয় ও প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী বাগধারার ব্যবহার বক্তার মনোভঙ্গিকে স্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জল করে তোলে। যেহেতু এসব বাগধারা লোকসমাজে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয় মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে, তাই মহেশডাঙার লোকমানুষের প্রাত্যহিক ভাষায় এর উপস্থিতি লক্ষণীয়।

> দেখি, কোন দিকের জল কোন দিকে গড়ায়। কার কপাল কত চওড়া হয়, দেখা যাক। (শওকত, ২০০১ : ১৪৫)
>
> দরিয়াবিবি ব্যঙ্গ স্বরে বলে, ওই মুখে ফুল-চন্দন দিতে ইচ্ছা করে। (শওকত, ২০০১ : ১৬২)
>
> সারাদিন কত কাজ করি, তবু মা'র কাছে গিয়ে লাগাবে, তোমার বউ পটের বিবি হয়ে শুয়ে থাকে। (শওকত, ২০০১ : ১৬৪)
>
> পরের হাত-তোলা খাওয়ার দরকার নেই আমার। (শওকত, ২০০১ : ১৬৫)

কখন থেকে বসে আছি। ডুমুর ফুলের খোঁজ নেই। (শওকত, ২০০১ : ১৭০)
আমাদের অবস্থা দেখছ না? হাত জানে ত মুখ জানে না। (শওকত, ২০০১ : ১৭১)
যা, আর কথার খই ফোটাতে হবে না। (শওকত, ২০০১ : ১৮০)
নদীর মোহনার কাছে একটা পিঠুলী গাছের তলায় বসিয়া আমজাদ আবার আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। (শওকত, ২০০১ : ১৮৪)
তুমিও দিদি, সামান্য বাতাসেই হেলে পড়ো? (শওকত, ২০০১ : ১৮৮)
বৌ নিয়ে হাড় মাংস পুড়ে ছাই হতে বসেছে। (শওকত, ২০০১ : ১৯৮)
তুমি আর অত ফফর-দালালি করো না। (শওকত, ২০০১ : ২০১)
দরিয়া ভাবী বলে সংসার করছে, আর কেউ হোলে ঢি ঢি করে ছাড়ত। (শওকত, ২০০১ : ২১২)
হাঁড়ির খবর আর হাটে ভেঙে লাভ নেই। (শওকত, ২০০১ : ২১২)
বুড়ো পাখি কী পোষ মানে বৌমা, চাল-ছোলা খাওয়ানোই সার। (শওকত, ২০০১ : ২১৯)
আমজাদ থ বনিয়া গেল। (শওকত, ২০০১ : ২২০)
পয়পয় করে মানা করেছি, কবরস্থানের দিকে যাস নে বাবা–বাবারা কান কুলো করে বসে থাকবে। (শওকত, ২০০১ : ২২৫)
একদম ভিজে বেড়াল-ছানা বনে গেলি যে (শওকত, ২০০১ : ২৩০)
দেখি কপাল ঠুকে–যা আছে ভাগ্যে। (শওকত, ২০০১ : ২৩৯)
চোখের মাথা খেয়ে বসে আছি। (শওকত, ২০০১ : ২৪০)
চন্দ্র কোটাল পালের গোদা সাজিয়াছে। (শওকত, ২০০১ : ২৫২)
দাদা, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, আমরা উলুখড়। (শওকত, ২০০১ : ২৬২)
মনের সুখে সে হাতের সাধ মিটাইল। (শওকত, ২০০১ : ২৬৫)
যখন কেউ বিনা দোষে তোমার উপর জুলুম করে, তখন ত ভিজে বিড়াল সেজে বসে রইলে। (শওকত, ২০০১ : ২৬৬)
আজ মোনাদির কি আজহারের প্রসঙ্গ আমিরন চাচী মুখ দিয়া বাহির করিল না, পাছে দরিয়াবিবি কষ্ট পায় বা হঠাৎ কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়। (শওকত, ২০০১ : ২৮৬)
পান হইতে চুন খসিলে শাঁসানি-বকুনি। (শওকত, ২০০১ : ৩০০)
গৃহে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর উপায় নাই। তা-ই হইল। ইয়াকুবের অগস্ত্য যাত্রা। (শওকত, ২০০১ : ৩১২)

শওকত ওসমানের *জননী* উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের মহেশডাঙা গ্রামের লোকসমাজের চালচিত্র বিশ্বস্ত শিল্পভাষ্যে উত্তীর্ণ। মুসলমান ও হিন্দু নির্বিশেষে সেখানকার শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষেরা নিত্যদিনের দিনযাপনে বংশপরম্পরায় বহমান লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তাদের সমষ্টিচেতনায় সন্নিহিত এসব লোকজ উপাদান এ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পরিচয় নির্দেশের স্মারক। এ উপন্যাসভুক্ত লোকসমাজের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক ওঠাবসায়, চালচলনে, আলাপচারিতায় বহুযুগ ধরে মেনে চলা বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধের পেছনে বিশেষভাবে সন্নিহিত রয়েছে যাবতীয় বিপদ, প্রতিকূলতা, লক্ষ্য অর্জনের বাধাকে পরাভূত করে পরিবাব-পরিজনকে নিয়ে স্বাভাবিক

জীবনযাপনের প্রত্যাশা। সমষ্টিমানুষের সংহতি ও মানবিক চেতনার উজ্জীবনের তাগিদে এ উপন্যাসে বাঙালি লোকসংস্কৃতির চালচিত্র শিল্পভাষ্যে উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. উদ্ধৃত, আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'শওকত ওসমান', *একুশের স্মারকগ্রন্থ ২০০০*, সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৪-১৫

২. কুদরত-ই-হুদা, *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস : আঙ্গিক বিচার*, আদর্শ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫৬

৩. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১২৩

৪. হুমায়ুন আজাদ, 'শওকত ওসমান : কথাসাহিত্যের পথিকৃত', *হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকার*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৬

৫. এ উপন্যাসের প্রকাশ সম্পর্কে সমালোচকরা বিভিন্ন তথ্য জানিয়েছেন —

ক. আর্থ-সামাজিক চেতনানিষ্ঠ শওকত ওসমানের প্রথম উপন্যাস 'জননী' (১৯৬১)। এটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা বুকস প্রকাশনী থেকে, জানুয়ারি, ১৯৬১ সালে। এর কিয়দংশ 'সওগাত' পত্রিকায় ১৯৪৪-৪৫ সনে ছাপা হয়। ...তখন এর নাম ছিল 'জিন্দান'। ১৯৬১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় মুখবন্ধে এই উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন —

> বৃটিশ আমলের পটভূমিকায় বিধৃত এই গ্রামকাহিনী অনেকের কাছে আজ রূপ কাহিনী মনে হতে পারে। ১৯৪০ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। স্বাধীন স্বদেশে এর সমাপ্তি। কাহিনীর পটভূমি চল্লিশ বছর আগেকার।
>
> অর্থাৎ, "১৯২০ এর দশকের সময়কালের বাংলাদেশের বিশেষত শওকত ওসমানের দেখা পশ্চিমবঙ্গের মহেশডাঙ্গা গ্রামের কৃষক পরিবারের জীবন চিত্রায়ণের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে 'জননী'র কাহিনী। এই উপন্যাসে লেখকের আর্থ-সামাজিক জীবনদৃষ্টির ব্যাপকতা তৎসঙ্গে বাংলার গ্রামীণ জীবনের নানা হাসি-কান্নার কাহিনী বিধৃত হয়েছে।" (অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫, পৃ. ৬৬)

খ. *জননী* উপন্যাসটি উর্দুতে আম্মিজান নামে অনূদিত হয়েছিল। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে *জননী* উপন্যাসটি রচনার সূত্রপাত এবং স্বাধীন স্বদেশে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর উপন্যাসটি লেখার কাজ শেষ হয়। (কুদরত-ই-হুদা, *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস : আঙ্গিক বিচার*, আদর্শ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৫)

গ. 'জননী' শওকত ওসমানের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাস লেখকের 'মুখবন্ধ' থেকে জানা যায়, ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এ উপন্যাস রচনার সূত্রপাত এবং স্বাধীন স্বদেশে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর লেখার কাজ শেষ হয়। 'মুখবন্ধ' থেকে আরো জানা যায় যে —

> নূতন পরিবেশে খসড়া উপন্যাসের কিছু অদল বদল করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এক যুগের দলিল হিসাবে, যথাযথ রাখাই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। ... উপন্যাসের কিয়দংশ 'সওগাত' পত্রিকায় ৪৪-৪৫ সনে ছাপা হয়। তখনই পুস্তকাকারে প্রকাশের সুযোগ থাকলে, রচনা বৃটিশ আমলেই সমাপ্ত হতে পারত। ... নানা ঝঞ্ঝাটে বিলম্বের সীমানা বিশ বছরে এসে দাঁড়াল। (শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, বাংলা

একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৯)

৬. বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় শওকত ওসমানের *জননী*-র অন্তর্ভুক্তি এবং প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত —

> যদিও জননী উপন্যাসের পটভূমি পূর্ববঙ্গ নয়, তবু পূর্ববাংলার উপন্যাসের আলোচনায় জননী অবশ্য আলোচ্য হয়ে ওঠে। এর কারণ একাধিক : প্রথমত, উপন্যাসটি শওকত ওসমানের রচনা, যিনি জন্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বাসিন্দা হলেও তার সৃষ্টিশীলতার বিকাশ-প্রকাশ ঘটেছে পূর্ববাংলায় তথা বাংলাদেশে। ফলে সৃষ্টিশীল সত্তা শওকত ওসমানের সৃষ্টিশীলতার পূর্ণ বিবরণ যখন হাজির করা হয় তখন সঙ্গত কারণেই তাঁর স্থান-কালনির্বিশেষ সৃষ্টিকর্মকে বিবেচনায় আনা হয়। তাই শওকত ওসমান সম্পর্কে যেকোনো মন্তব্যে এবং আলোচনায় পূর্ববাংলার ভূমিজ উপন্যাস না হওয়া সত্ত্বেও জননী ধর্তব্যের মধ্যে চলে আসে। দ্বিতীয়ত, জননী উপন্যাসে প্রথম বাঙালি মুসলিম পরিবারের অন্দরমহলের সংস্কৃতি এবং বহির্বাস্তবতার সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। এর আগে রচিত অধিকাংশ উপন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম পরিবার ও সমাজের মূল্যবোধের সংস্কার। সেসব উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মুসলিম সম্প্রদায়ের অভিভাবক হয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু এ উপন্যাসে ওসমান সম্প্রদায়ের অভিভাবকের দায়িত্ব নেননি, শিল্পীর ভূমিকা নিয়েছেন। তৃতীয়ত, যে কারণে জননী বহুল আলোচিত উপন্যাস তা হলো, উপন্যাসটিতে প্রথম একজন বাঙালি মুসলমানের মহৎ শিল্পসৃষ্টির ব্যাকুলতা, সম্ভাবনা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। ... এ কথা স্বীকার্য যে, একটি নির্দিষ্ট ল্যান্ডস্কেপের জীবনকে উপস্থাপনের জন্য ভাষার মধ্যে যে আকাঁড়া স্বর এবং ভঙ্গির প্রয়োজন ছিল, তা *জননী*তে নেই বললেই চলে। ... জননীর ভাষার মধ্যে কৃত্রিমতা এবং আড়ষ্টতা দুর্লক্ষ নয়। অবশ্য এটি শওকত ওসমানের যাবতীয় গদ্যকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর নিজস্ব গদ্য ভাঙা-ভাঙা, হোঁচট খাওয়া, আড়ষ্ট। জননী তার ব্যতিক্রম নয়। (*শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস : আঙ্গিক বিচার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬, ৯২)

৭. এ উপন্যাস সম্পর্কে কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত —

> শওকত ওসমানের মতো কালসচেতন লেখক যে উপন্যাসটির (জননী) রচনাকালের তপ্ত পটভূমি পরিত্যাগ করে সোজা বিশ বছর পেছনের গ্রামজীবন নিয়ে লেখার মনস্থ করেছিলেন তাতে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় মেলে। আমার ধারণা তিনি সঠিক বিষয়বস্তুই বেছে নিয়েছিলেন। ... বড়ো বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে শওকত ওসমান যখন গ্রামই বেছে নিলেন তাঁর উপন্যাসের জন্যে, তখন নিঃসন্দেহে তিনি চটকদারির মোহ বর্জন করে দরদী শিল্পীর ভূমিকাই পালন করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে আমরা পেয়েছি 'জননী'র মতো উপন্যাস — বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। যে আন্তরিকতা ও মমতার সঙ্গে তিনি এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন তা আর কোনোদিন এমন কি তাঁর মধ্যেও দেখা যায় নি। সাধারণভাবে উপন্যাস সাহিত্যের কথা ভাবলে 'জননী'কে মহৎ উপন্যাস বলা যাবে না, কিন্তু সীমিত পরিসরে এই উপন্যাসটির সার্থকতা প্রশ্নাতীত। এই শতাব্দীর প্রথমদিকের গ্রামগুলির গঠন, আর্থনীতিক বিন্যাস, হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজের বাস্তব ও সত্য সম্মিলিত জীবনযাপন, শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানুষের সহাবস্থানের প্রচণ্ড দাবি এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট তীক্ষ্ণ রেখাঙ্কিত ব্যক্তি এমন ঔপন্যাসিক সততায় আমাদের উপর ছাপ ফেলে যায় যে তা কোনোরকমেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না। ('দুই যুগের দেশ মানুষের কথা', *হাসান আজিজুল হক রচনাসংগ্রহ-৪*, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮-১৯)

৮. শওকত আলীর অভিমত —

> "জননী একজন সৃজনশীল তরুণ লেখকের জীবন ও জগৎ পর্যবেক্ষণমান ও গভীরে বিশ্বস্ততা দিয়ে

> নির্মিত এক নতুন শিল্পরূপ।" তিনি এই উপন্যাসের তিনটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। '১. যাপিত জীবনের বাস্তবতা উপন্যাসখানির মৌলিক উপাদান। ২. চরিত্র-সৃষ্টিতে কোনোরকম বানানো ব্যাপার নেই, চরিত্রগুলো জীবন থেকে খুবই স্বাভাবিকভাবে কাহিনীর মধ্যে উঠে এসেছে এবং ৩. ওপর থেকে চাপানো কোনো নীতিশিক্ষা কিংবা আদর্শ প্রচার এ উপন্যাস রচনার পেছনে কাজ করেনি। (শান্তনু কায়সার, *শওকত ওসমান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৪)

৯. সৈয়দ আকরম হোসেন জানিয়েছেন —

> জননী শওকত ওসমানের মানবতাবাদী চেতনাপ্রবাহের ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ। ... সমাজের অন্তঃঅসঙ্গতিজাত দ্বান্দ্বিক অগ্রগামী চিত্ররূপ হতে গিয়েও 'জননী'র দরিয়াবিবি হয়েছে ট্রাজেডিতে পরিণত। মাতৃত্বের গৌরবই হয়েছে সারকথা। দরিয়া বিবির চেতনায় জীবনসংগ্রাম মাতৃত্ব উৎসজাত। শওকত ওসমানের Pictorial treatment এবং Dramatic treatment-এর জন্ম তার যথাস্থিতবাদী নিরাসক্ত মানসলোকে। (প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১)

১০. এ উপন্যাসের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সমালোচকদের মনোযোগ অর্জন করেছে। সৈয়দ আকরম হোসেন (*প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*), মনসুর মুসা (*পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*), শান্তনু কায়সার (*শওকত ওসমান*), ভুঁইয়া ইকবাল (*বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র*), রফিকউল্লাহ খান (*বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*), শিরীণ আখতার (*বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*), হোসনে আরা জলী (*শওকত ওসমান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*), আবুল আজাদ (*শওকত ওসমানের উপন্যাস*), কুদরত-ই-হুদা (*শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস : আঙ্গিক বিচার*) প্রমুখ এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। শিরীণ আখতার এক বাক্যে এ উপন্যাসে বিধৃত লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে জানিয়েছেন — 'মুসলিম সমাজের নানা প্রথা, লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের নানা দিকও এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।' (পৃ. ৩৩) তিনি এরপর এ প্রসঙ্গে উপন্যাস থেকে এ সংক্রান্ত তিনটি দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। চন্দ্রকোটালের স্বভাবে বিদ্যমান লোকসঙ্গীতপ্রীতি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন 'তার কথায় ও গানে গ্রামবাংলার লোকজীবনের কথা ও সুর ধ্বনিত হয়েছে। এক সময় এ ধরনের লোককবিতা ও গান সাধারণ মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত।' (*বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬)

গ্রন্থপঞ্জি

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*। ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।

আবুল আজাদ (২০০৮)। *শওকত ওসমানের উপন্যাস*। গ্লোব লাইব্রেরি প্রাঃ লিমিটেড, ঢাকা।

কুদরত-ই-হুদা (২০১৩)। *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস : আঙ্গিক বিচার*। আদর্শ, ঢাকা।

ভুঁইয়া ইকবাল (১৯৯১)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মনসুর মুসা (১৯৭৪)। *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*। পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০১)। *উপন্যাস সমগ্র ১*। সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শান্তনু কায়সার (২০১৩)। *শওকত ওসমান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শিরীণ আখতার (১৯৯৩)। *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (২০০০)। *একুশের স্মারকগ্রন্থ।* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৯৭)। *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক (২০০৩)। *রচনাসংগ্রহ-৪*। সাহিত্যিকা, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০১২)। *হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকার।* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হোসনে আরা জলী (২০১৩)। *শওকত ওসমান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। উৎস প্রকাশন, ঢাকা।